





শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

হৈ হৈ কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ





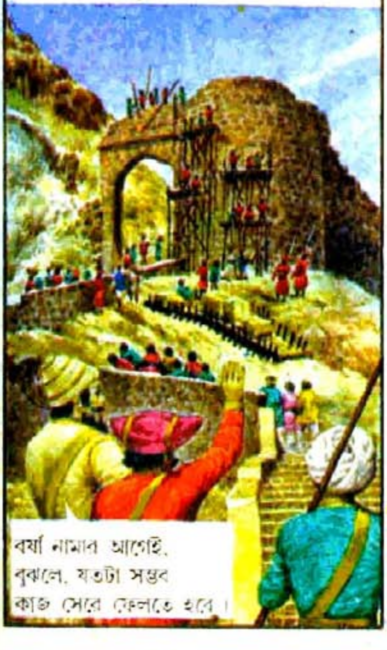



সাহস আর বুদ্ধির জোরে সদাশিব এখন সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। যুদ্ধবিদ্যায় তার হাতেখড়ি হয়েছে। এখন সে শিবাজির খাস দেহরক্ষী সিপাইদের একজন ...

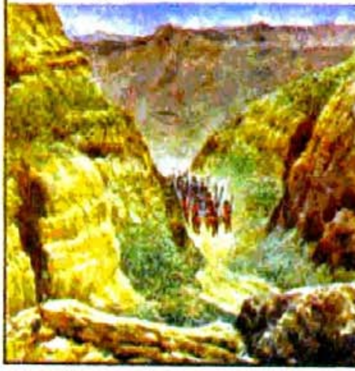

তবু তার মনে একটা দুঃখ আছে ...
ভাল করে গোঁফটা বেরুচ্ছে না এখনো। গোঁফ নইলে কি সেপাই মানায় ?


এদিকে গ্রীষ্মকাল ফুরিয়ে এল, বর্ষা নামতে আর দেরি নেই। শিবাজি এখন বেশির ভাগ সময় তোর্না দুর্গে থাকেন। তবে ...

তোর্না দুর্গের পাশেই নতুন দুর্গ রাজগড় তৈরি হচ্ছে। শিবাজি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুর্গ গড়ার কাজ তদারক করেন।



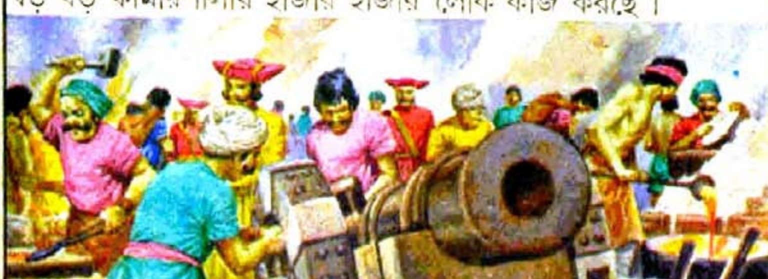
মাঝে মাঝে শিবাজিকে দলবল নিয়ে পুনায় যেতে হয়



অন্যান্য দেহরক্ষী সেপাইদের মতো সদাশিবও তাঁর সঙ্গে থাকে।



পুনায় নানারকম অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সাঁজোয়া তলোয়ার তৈরি হচ্ছে, বড় বড় কামারশালায় হাজার হাজার লোক কাজ করছে।



চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস


কী ? কাজকর্ম ঠিকমতো এগোচ্ছে তো ?
যে আজ্ঞে !


মনে রাখিস সদাশিব, এই অস্ত্রের জোরে একদিন আমার স্বপ্নকে সফল করব । অখণ্ড মারাঠা রাজ্য…ধর্মরাজ্য !


তোর্না দুর্গে জিজাবাঈ-এর মহলের পাশে একটা ছোট্ট কুঠুরিতে সদাশিবের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ।


মাঝে মাঝে
আশেপাশে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে…


একদিন ভোরবেলা কী একটা কাজে বেরিয়ে গেছে সদাশিব, জিজাবাই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ান।
স-দা-শি-ব-! ...
এ কী! গেল কোথায়?
বিছানার হালটা দেখ একবার! ... ইশ্!
এগিয়ে এসে নিজের হাতেই বিছানাটা গোছাতে শুরু করে দেন জিজা-মা।
বালিশটা তুলে ঝাড়তে গিয়ে হঠাৎ 'ঠুং' করে কী একটা আওয়াজ হয়।

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


ওদিকে, ঘোড়াশালে পক্ষিরাজকে দানাপানি খাওয়াচ্ছে সদাশিব। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়—
এই রে!
আংটিটা তো বালিশের তলা থেকে সরানো হয়নি! মা ঘর পরিষ্কার করতে আসবেন, যদি দেখতে পান!
সদাশিব এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে
তন্নতন্ন করে বিছানা-বালিশ খুঁজতে শুরু করে…



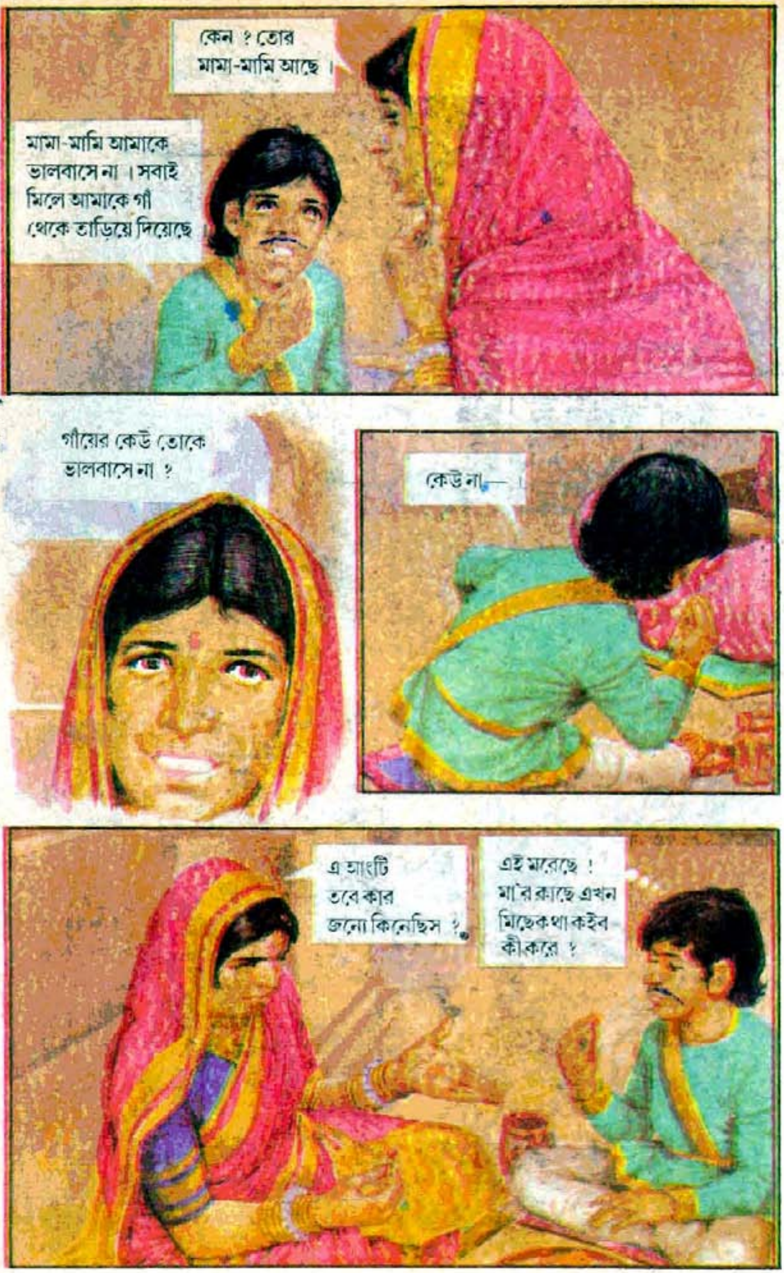
চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


জিজাবাইয়ের ঘর । জিজাবাই খাবারের থালা সাজিয়ে বসে আছেন…
এসো
আয় সদাশিব
তোরা আজ রাত্তিরে পুনায় চলে যাবি । কবে ফিরবি ঠিক নেই । তোর জন্যে মোতিচুরের লাড্ডু করেছি । বোস, খেয়ে নে ।
সদাশিব গুটি গুটি খেতে বসে । দাসী চলে যায় ।…



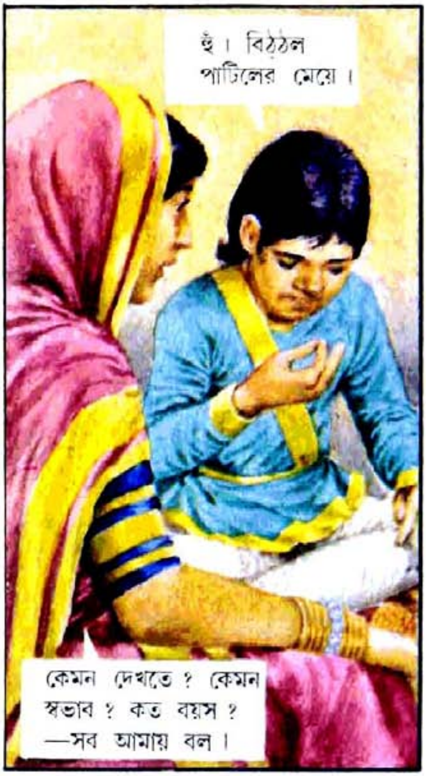
(এর পর আগামী সংখ্যায়


কেন ? তোর মামা-মামি আছে ।
মামা-মামি আমাকে ভালবাসে না । সবাই মিলে আমাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ।
গাঁয়ের কেউ তোকে ভালবাসে না ?
কেউ না— ।
এ আংটি তবে কার জন্যে কিনেছিস ?
এই মরেছে ! মা'র কাছে এখন মিছেকথা কইব কীকরে ?

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস



(এরপরে আগামী সংখ্যায়)





সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ ধরে যায়! কুঙ্কুর চিন্তায় ঝলমল করে ওঠে সদাশিবের মুখ!




—হ্যাঁ মা, কৃষ্ণই আমাকে বলেছিল—তুমি শিবাজির কাছে যাও। শিবাজি ডাকাত নয়, তিনি একদিন দেশের রাজা হবেন।
বাঃ! কৃষ্ণ তো ভাল মেয়ে, খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুই তার জন্যে আংটি কিনেছিস, বেশ করেছিস।
… কিন্তু দিবি করে? যা, গাঁয়ে যা, আংটি তাকে দিয়ে আয়।
সদাশিবের মন খুশিতে নেচে ওঠে… !! তবু সে মুখটা একটু কাচুমাচু করে বলে—
কী করে যাব মা, কত কাজ রয়েছে। আজ শিব্বারাও-এর সঙ্গে পুনা যেতে হবে। যতদিন না বর্ষা নামছে ততদিন কাজের ছুটি নেই। আর বর্ষা নামলে চারদিক জলে ভরে যাবে, তখন কি যেতে পারব?
আচ্ছা, আমি শিব্বাকে বলব'খন
না না, শিব্বারাওকে কিছু বলতে হবে না। উনি নিজে থেকে যখন ছুটি দেবেন তখন যাব।



ক্রমে চাঁদ উঠল ।



ভাঙা চাঁদের আবছা আলোতে শিবাজির দল চলেছে—ঠিক যেন একটা পাহাড়ি ময়াল সাপ ।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

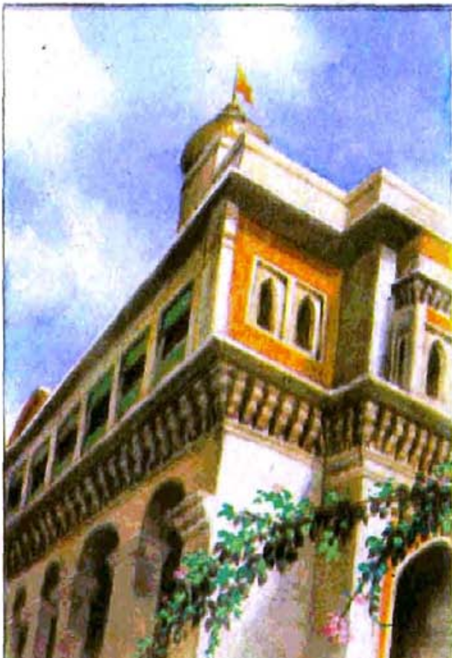


রাত্রির প্রথম প্রহর কেটে গেছে।
শিবাজি পঞ্চাশজন বারগির নিয়ে দুর্গ থেকে বেরুলেন। সঙ্গে সদাশিব।



পুনা তখন একটা বড় গোছের গ্রাম ছিল, শহর হয়ে দাঁড়ায়নি। বেশির ভাগ ঘর-বাড়ির চাল খড়ের। মাঝখানে শিবাজির বাবা শাহজির সাবেক মহল, প্রকাণ্ড চক-মিলানো ইমারত।

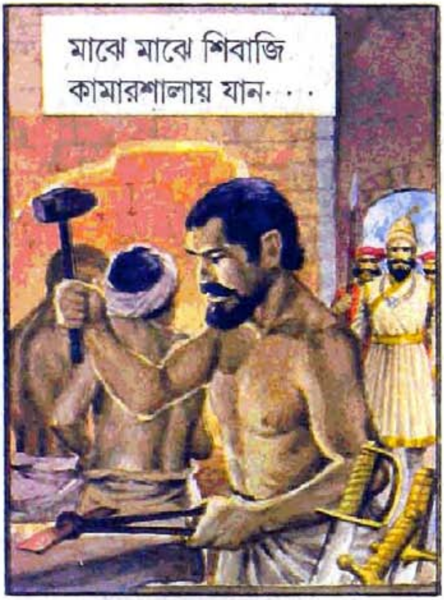


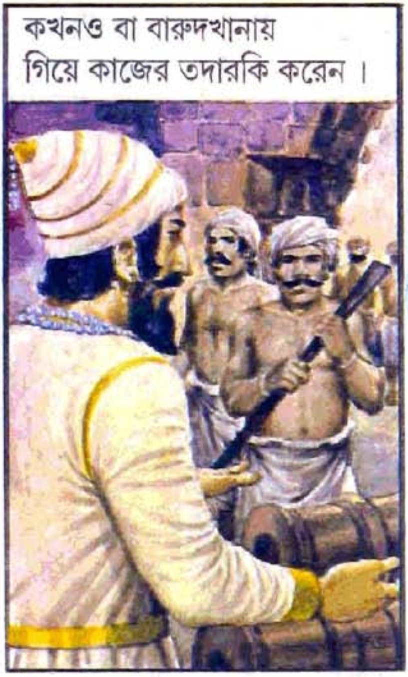


পুনা শাহজির জাগির ছিল। শাহজি এখানে স্ত্রী-পুত্রকে দাদোজি কোণ্ডদেব নামে এক ব্রাহ্মণের জিম্মায় রেখে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করতে চলে গিয়েছিলেন। তারপর আর ফিরে আসেননি। দাদোজি কোণ্ডদেব শিবাজির অভিভাবক ছিলেন। তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। শিবাজি স্বাধীন হয়ে সমস্ত মারাঠা দেশ নিজের কব্জায় আনার চেষ্টা করছেন। পুনা তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র।


পুনায় শিবাজির প্রায় দু'হাজার সিল্লাদার সৈন্য আছে। তারা স্থায়ী সৈন্য নয়। বর্ষা নামলে যুদ্ধ থেমে যায়, তখন তারা যে-যার খেত-খামারে কাজ করতে চলে যায়।
আবার বর্ষা কেটে গেলে দশহরার দিন এসে হাজির হয়।
শিবাজি সদলবলে এসে নিজের পৈতৃক মহলে উঠলেন।
বিরাট মহলে অনেক জায়গা, অসংখ্য ঘর। পঞ্চাশজন বার্গির রক্ষী মহলের মধ্যে রইল।







বাকি সময় দপ্তরখানায় বসে
সব্‌নিস চিট্‌নিস সুবাদারথানাদারদের
সঙ্গে পরামর্শ করছেন ।

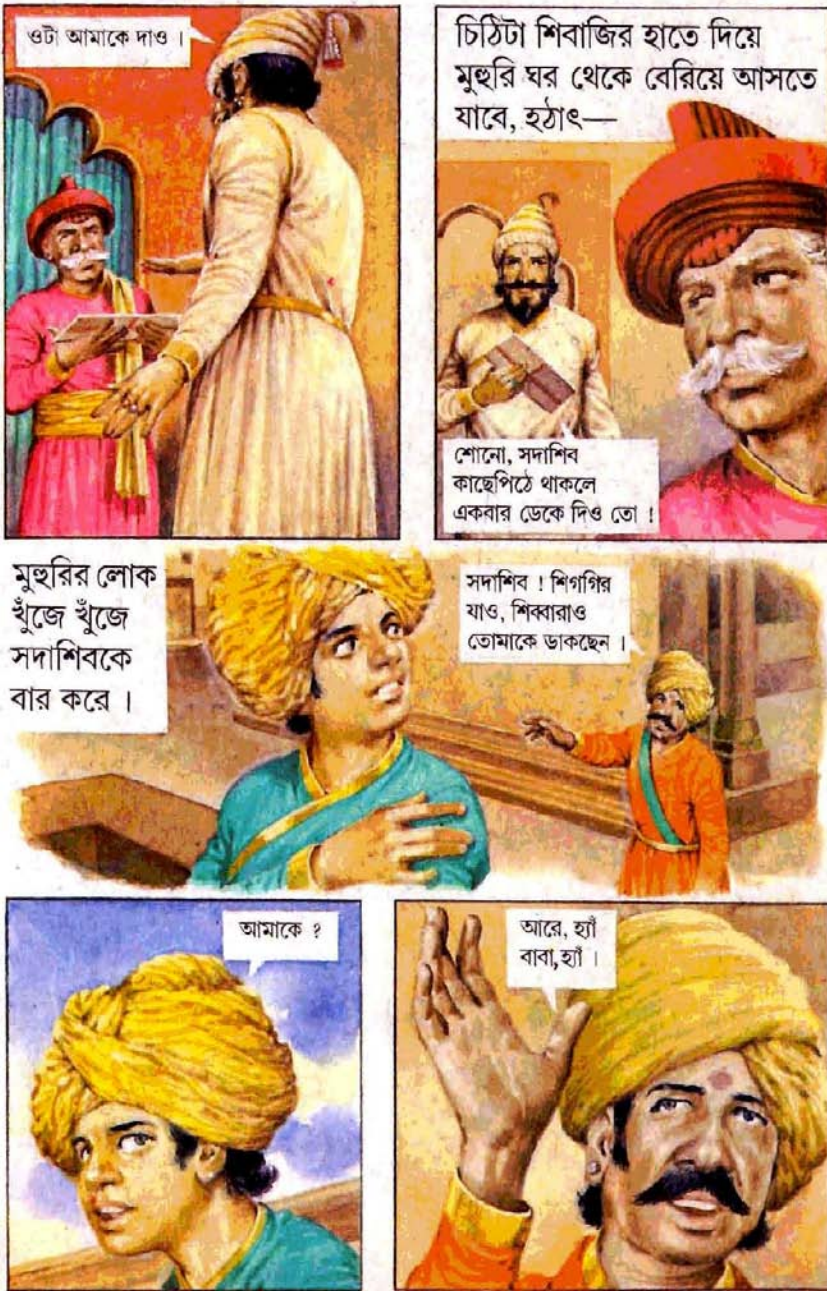


ভিতরে ভিতরে একটা উদ্যোগ
চলছে, কিন্তু বাইরে
কিছু প্রকাশ নেই ।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


সদাশিব সবসময় শিবাজির কাছে-কাছে ঘোরে—
কিন্তু শিবাজি নিজের কাজে এমন মগ্ন হয়ে আছেন যে সদাশিবকে লক্ষই করেন না।
মা জিজাবাই বোধহয় শিব্বা রাওকে আমার গাঁয়ে যাবার কথা বলতে ভুলেই গেছেন···
কয়েকদিন পরে··· একদিন শিবাজি গোপনে মুহুরিকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছেন···
যেমন যেমন বললুম, ঠিকমতো লিখেছ তো ?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
এবার গালা দিয়ে চিঠিটা ভাল করে মোহর করো···
মুহুরি চিঠিটা বন্ধ করে গালা লাগায়। মোহর এঁকে দেয়···


ওটা আমাকে দাও ।
চিঠিটা শিবাজির হাতে দিয়ে মুহুরি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে, হঠাৎ—
শোনো, সদাশিব কাছেপিঠে থাকলে একবার ডেকে দিও তো !
মুহুরির লোক খুঁজে খুঁজে সদাশিবকে বার করে ।
সদাশিব ! শিগগির যাও, শিব্বারাও তোমাকে ডাকছেন ।
আমাকে ?
আরে, হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ ।



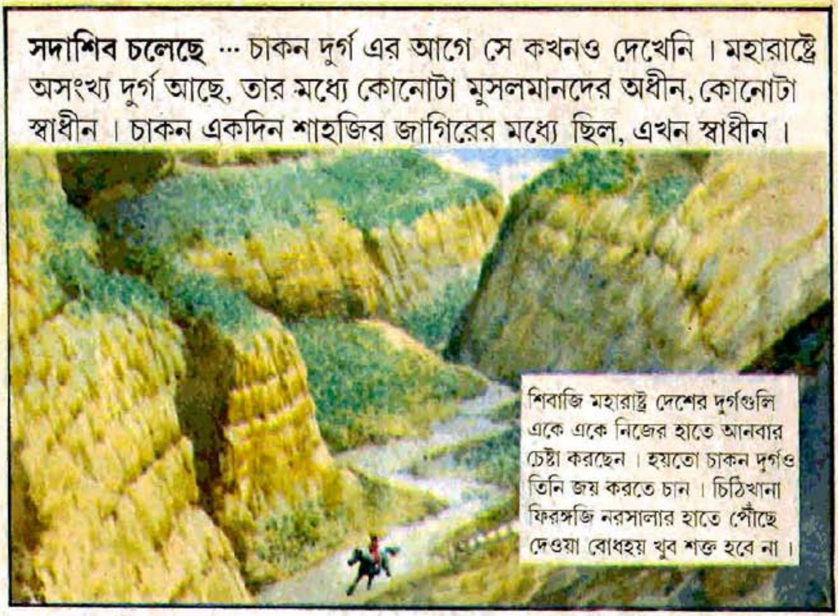
সদাশিব তখন শিবাজির কাছে গিয়ে বলে···
আমাকে ডেকেছ শিববারাও ?
কাছে আয় !
হ্যাঁ রে, মা'র মুখে শুনলাম তুই নাকি গাঁয়ে যেতে চাস ?
তুমি যদি ছুটি দাও রাজা, তাহলে যেতে পারি ।
তুই তো ডোঙরপুরের ছেলে ? ডোঙরপুর পুনা থেকে কতদূর ?
পঁচিশ কোশ উত্তরে ।
তা বেশ, যা । কতদিনে ফিরবি ?
তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরতে পারব ।— কবে যাব ?

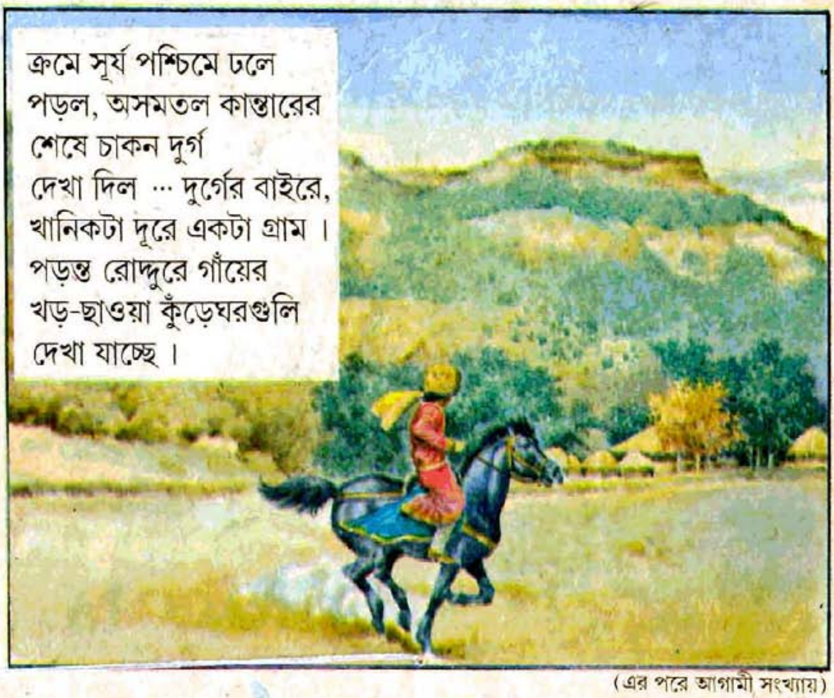


আজই বেরিয়ে পড় না। যত শিগগির যাবি, তত শিগগির ফিরতে পারবি।
আচ্ছা।
আর শোন, তুই চাকন দুর্গ চিনিস ?
চাকন দুর্গ ? শুনেছি পুনার উত্তরে।
হ্যাঁ। বেশি দূরে নয়। এখন যদি বেরিয়ে পড়িস সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে পারবি। তোর গাঁয়ে যাবার রাস্তা থেকে একটু পশ্চিম দিকে বেঁকে যেতে হবে। আমি তোকে রাস্তা বাতলে দেব।
চাকন দুর্গে কিছু দরকার আছে ?
আছে। এই চিঠিখানা চাকন দুর্গের সর-ই-নৌবত ফিরিঙ্গজি নারসালাকে দিতে হবে। এখন যা বলি মন দিয়ে শোন—

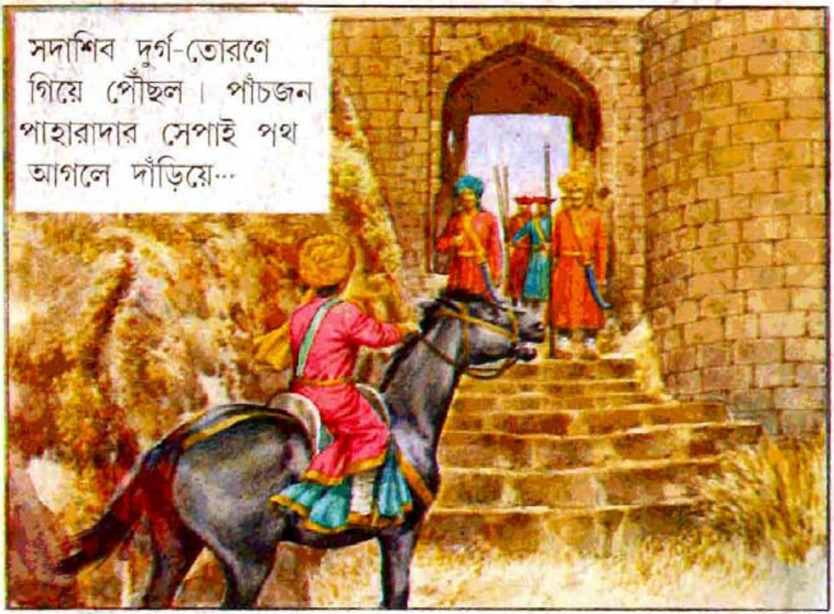
(এর পরে আগামী


তারপর সাজসজ্জা করে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে উত্তর-মুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় …
চাকন দুর্গ থেকে পুনা ন'দশ ক্রোশ পথ। সন্ধের আগেই পৌঁছতে হবে।
গাঁয়ে আর-সবাই আমার শত্রু। কিন্তু কুঙ্কু আমার বন্ধু। কুঙ্কুকে দেব বলে আংটি নিয়ে যাচ্ছি …
সুতো বেঁধে আংটিটা রেখে দিয়েছি আঙরাখার তলায়— বুকের কাছে। কুঙ্কু পেলে যা খুশি হবে না!
কিন্তু কুঙ্কুর বাবা বিঠ্ঠল পাটিল আমাকে দেখে খুশি হবে কি?



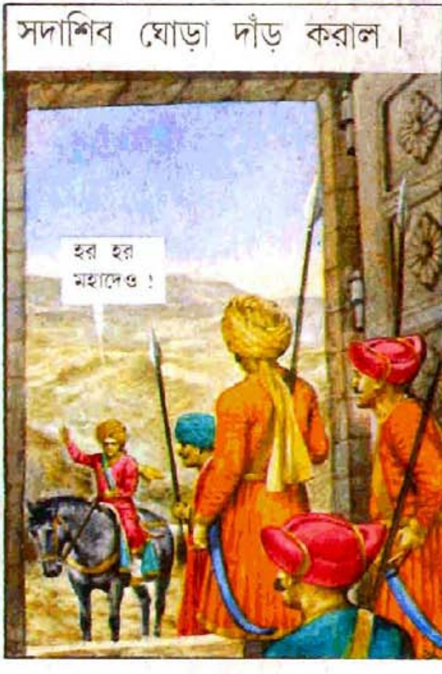


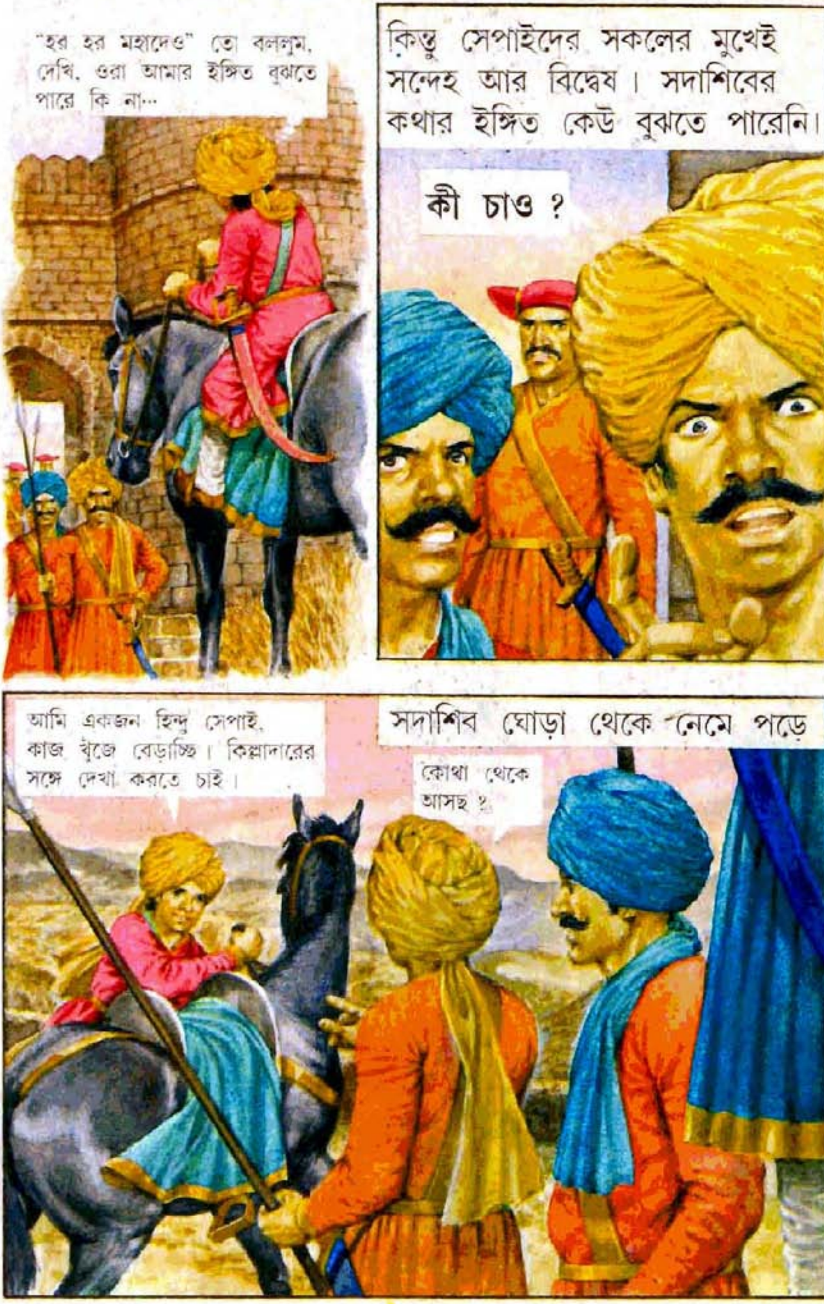
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



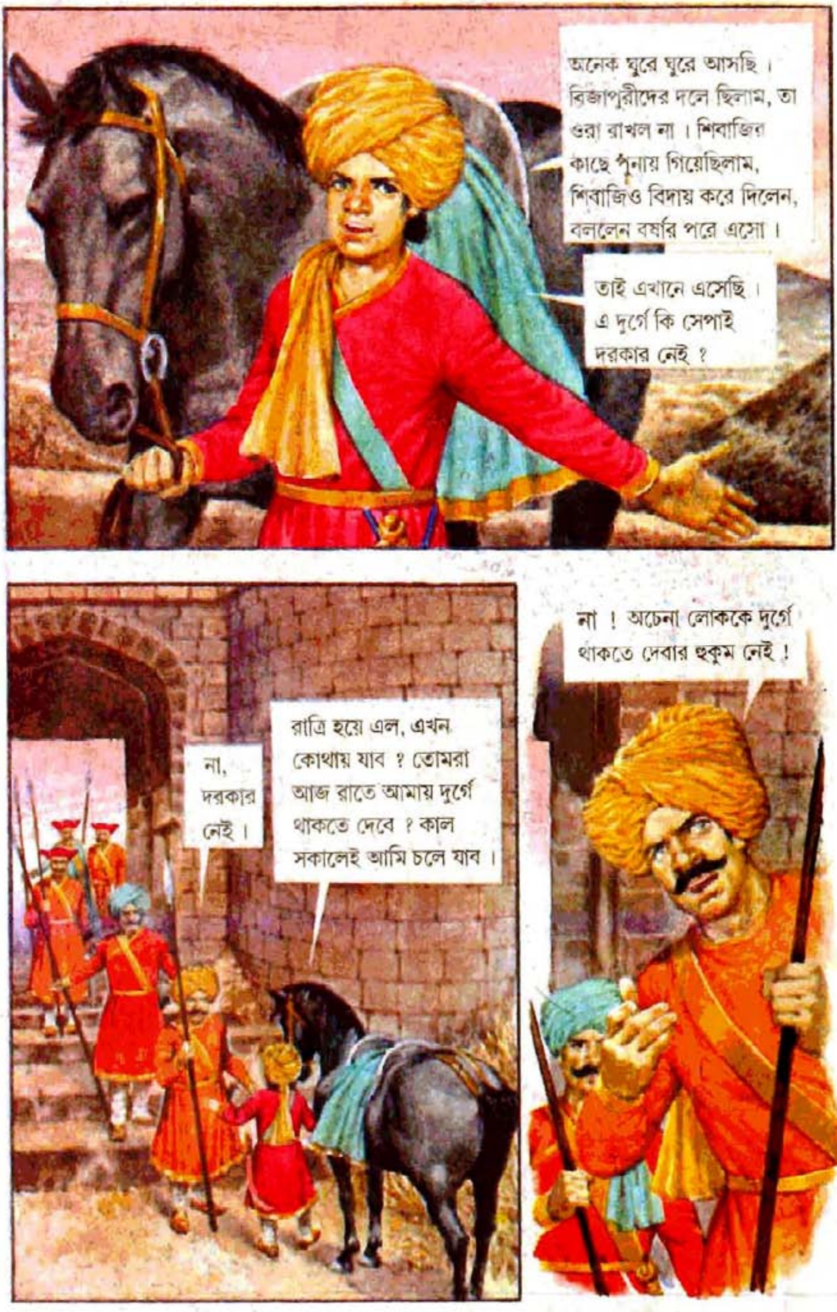
হঠাৎ, একজন সেপাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল





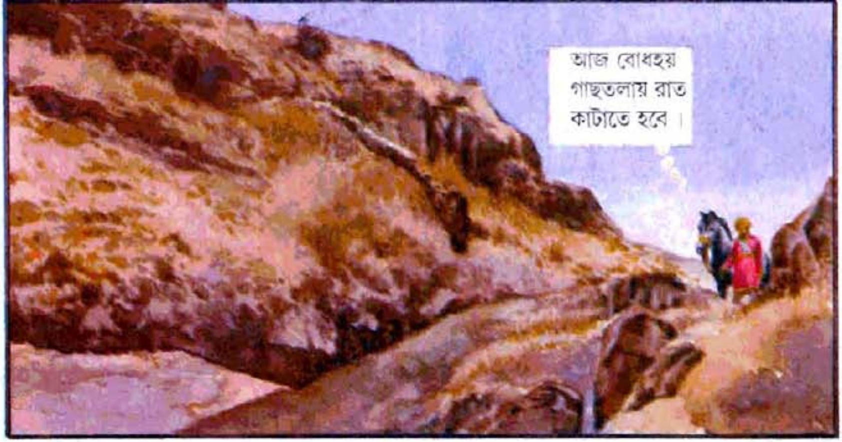


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

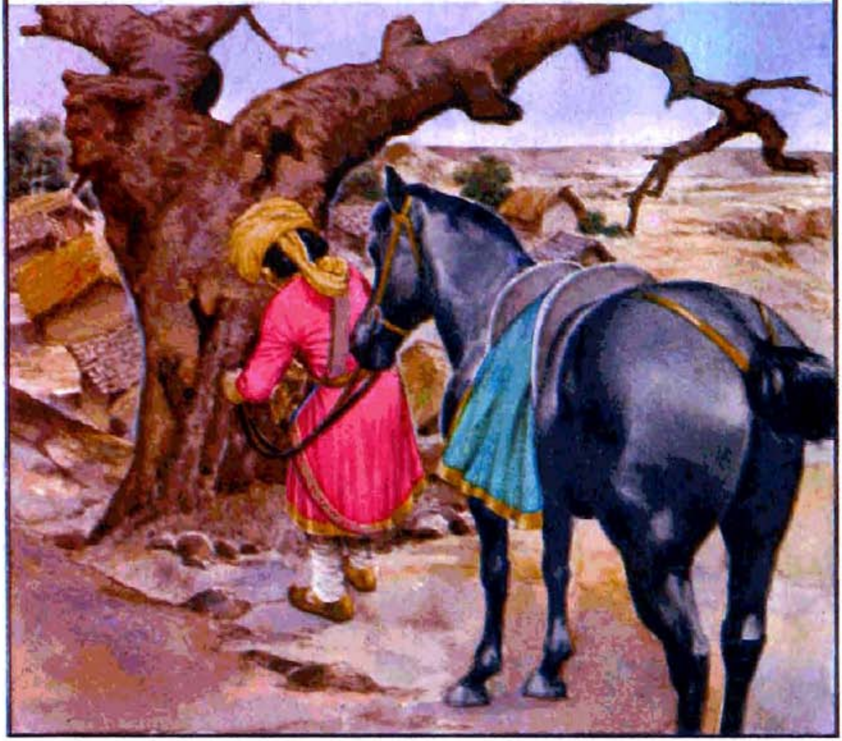

অনেক ঘুরে ঘুরে আসছি। বিজাপুরীদের দলে ছিলাম, তা ওরা রাখল না। শিবাজির কাছে পুনায় গিয়েছিলাম, শিবাজিও বিদায় করে দিলেন, বললেন বর্ষার পরে এসো।
তাই এখানে এসেছি। এ দুর্গে কি সেপাই দরকার নেই ?
না, দরকার নেই।
রাত্রি হয়ে এল, এখন কোথায় যাব ? তোমরা আজ রাতে আমায় দুর্গে থাকতে দেবে ? কাল সকালেই আমি চলে যাব।
না ! অচেনা লোককে দুর্গে থাকতে দেবার হুকুম নেই !



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



দুর্গ আর গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পাতা-ঝরা গাছ। তার শুকনো ডালে সদাশিব ঘোড়া বাঁধল।

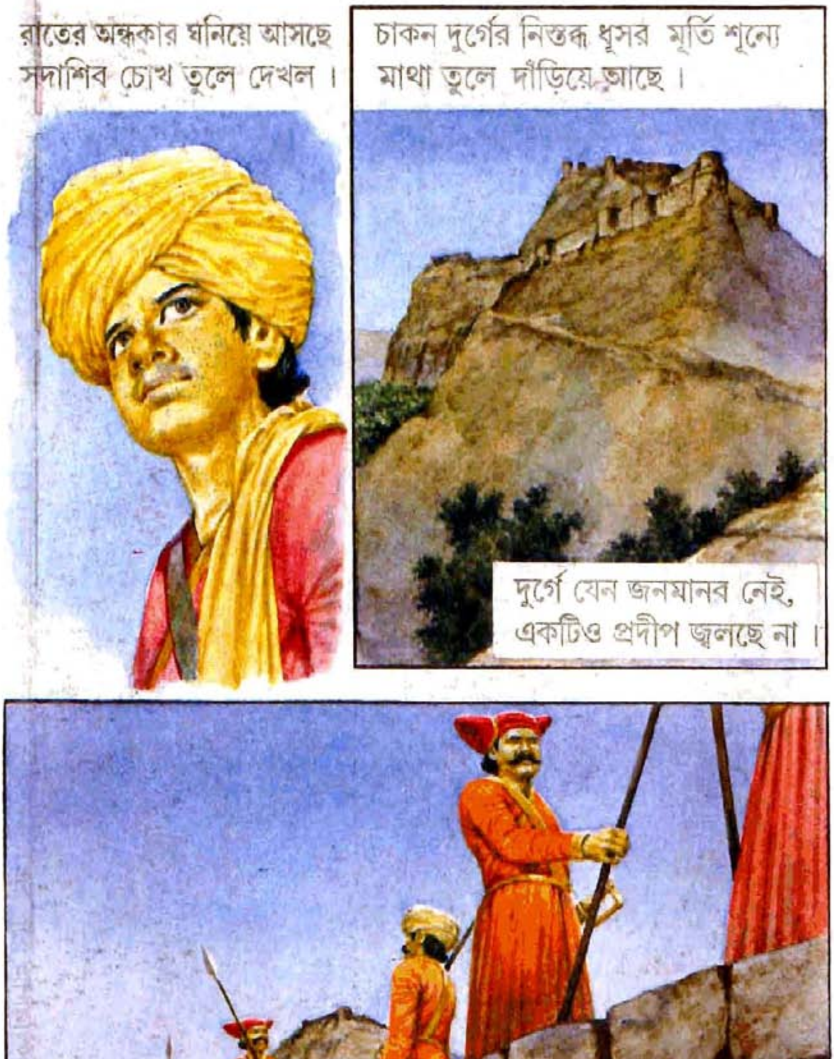








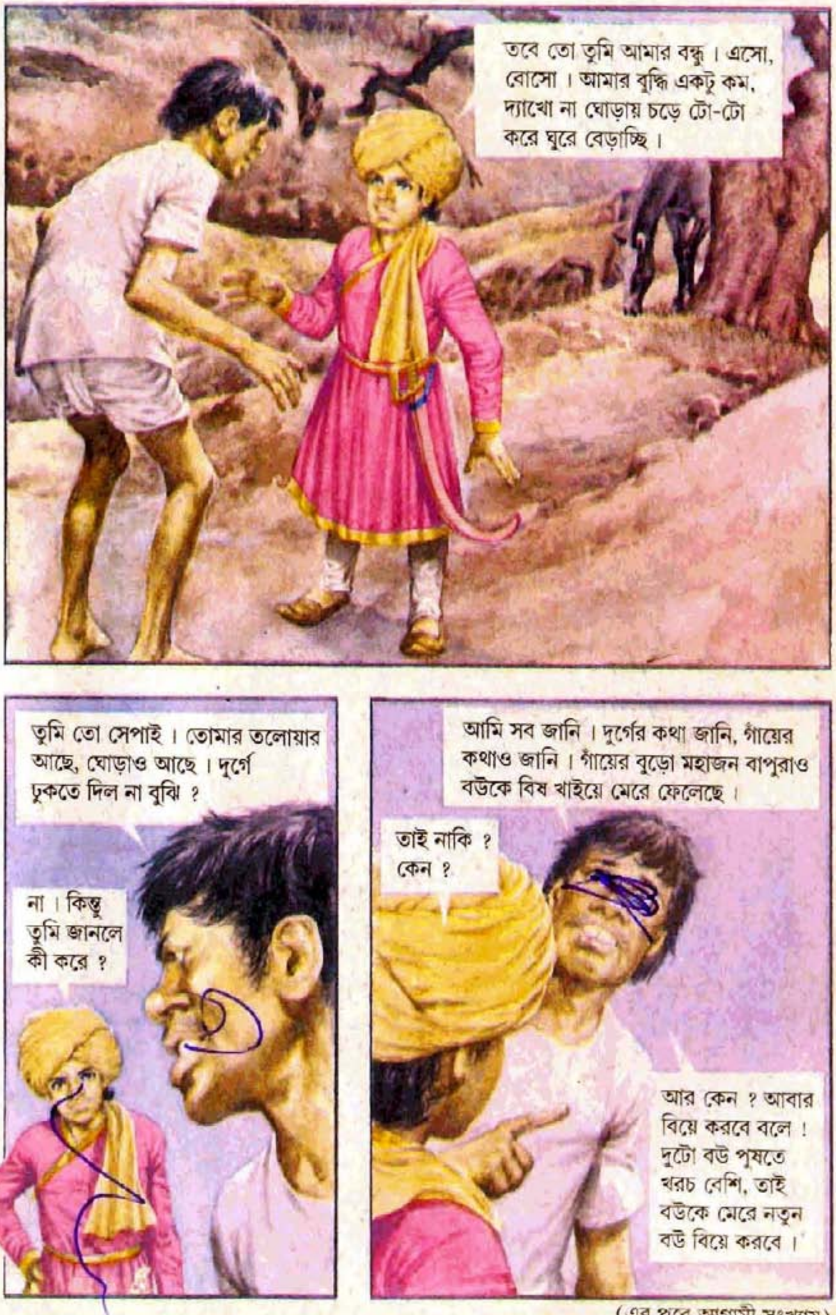
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে
সদাশিব চোখ তুলে দেখল।
চাকন দুর্গের নিস্তব্ধ ধূসর মূর্তি শূন্যে
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।
দুর্গে যেন জনমানব নেই,
একটিও প্রদীপ জ্বলছে না।
কেবল প্রাকারের ওপর
টহলদার প্রহরী
নিশাচর পাখির মতন
ঘুরে বেড়াচ্ছে।...

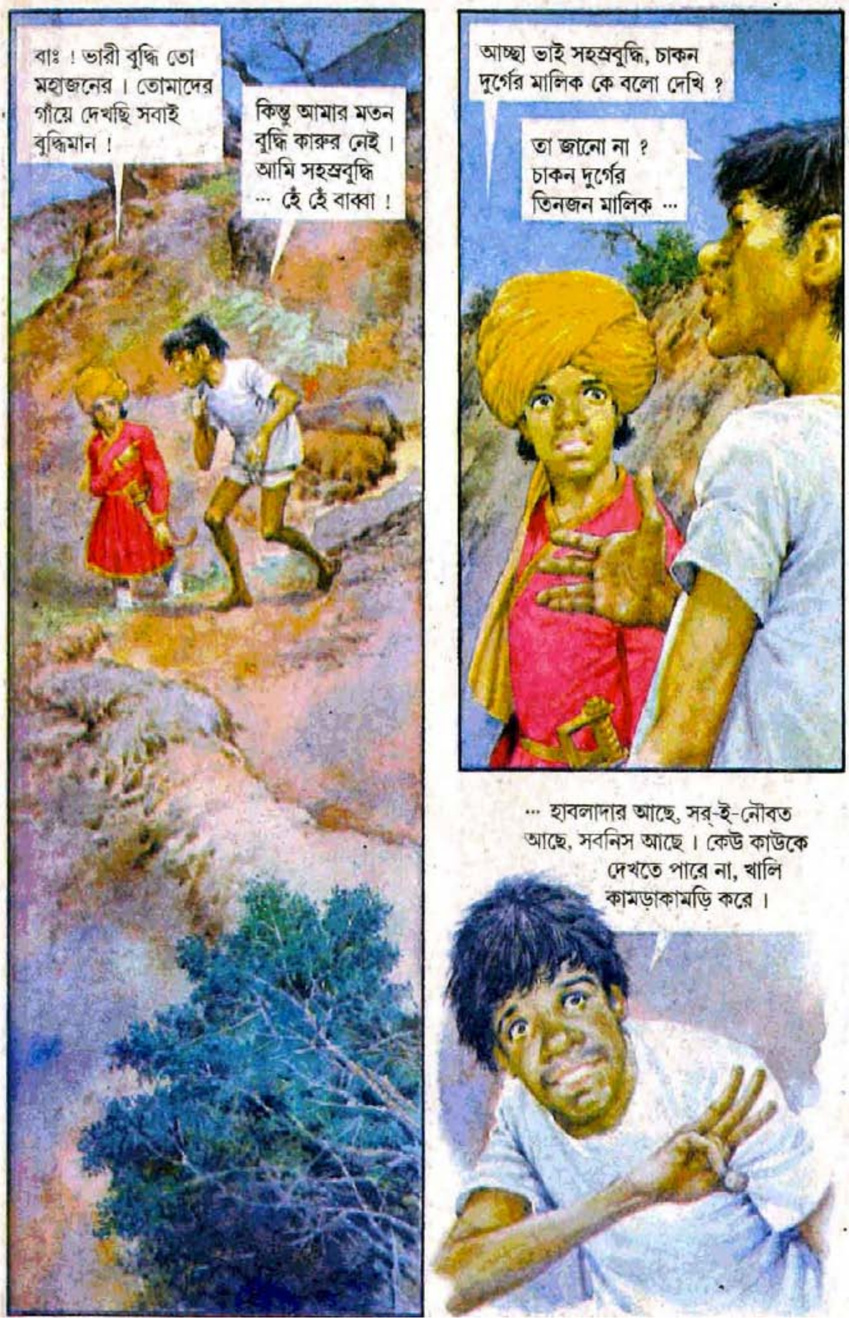


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


হিহি...আমার নাম সহস্রবুদ্ধি
খেয়েছে ! এ
আবার কে ?
তাই নাকি ?
তাহলে তো তোমার
অনেক বুদ্ধি !...এই
গাঁয়েই থাকো বুঝি ?
হ্যাঁ । গাঁয়ের লোক আমাকে
পাগলা বলে, আমি কিন্তু
পাগল নই । আমার ভীষণ
বুদ্ধি, আমি স-ব জানি ।
বুঝেছি । লোকটার মাথায় কিছু
নেই । সব গাঁয়েই এক-আধটা
পাগলাটে ধরনের লোক থাকে,
এ-গাঁয়ের পাগলাটে লোক সহস্রবুদ্ধি ।
তবে তো একে কাজে
লাগানো যায় !

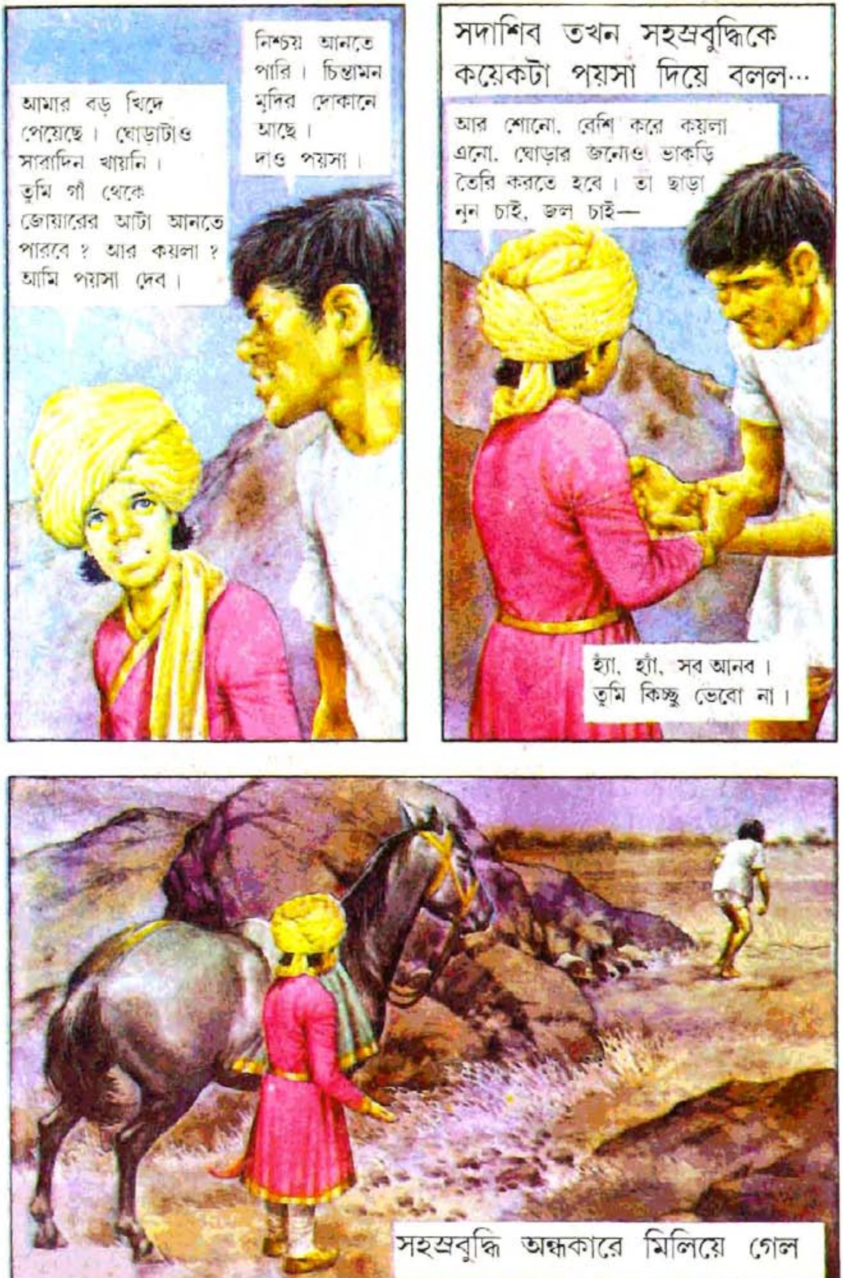


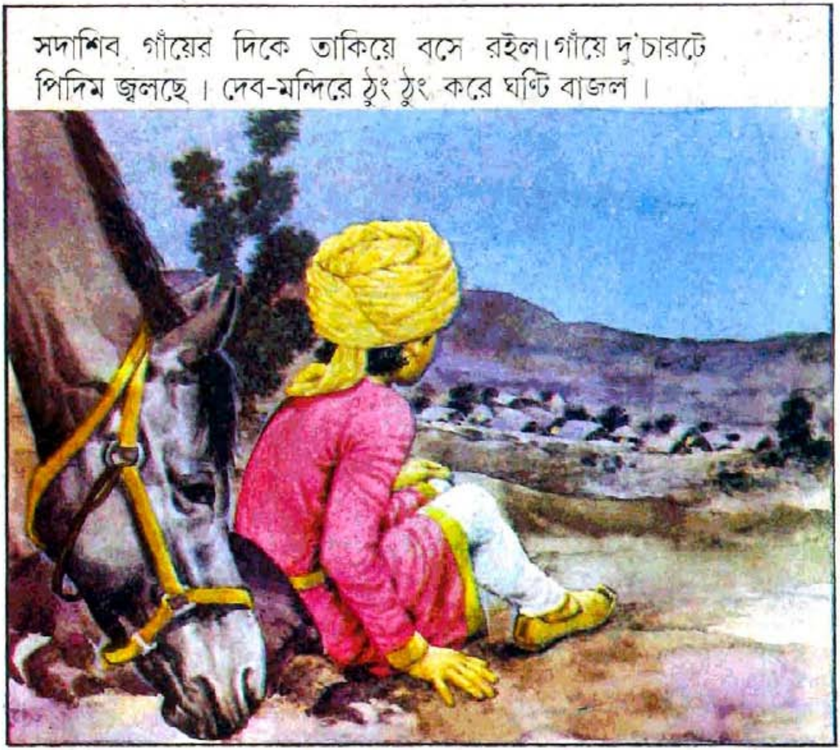
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



বাঃ ! ভারী বুদ্ধি তো মহাজনের । তোমাদের গাঁয়ে দেখছি সবাই বুদ্ধিমান !
কিন্তু আমার মতন বুদ্ধি কারুর নেই । আমি সহস্রবুদ্ধি ... হেঁ হেঁ বাব্বা !
আচ্ছা ভাই সহস্রবুদ্ধি, চাকন দুর্গের মালিক কে বলো দেখি ?
তা জানো না ? চাকন দুর্গের তিনজন মালিক ...
... হাবলাদার আছে, সর্‌-ই-নৌবত আছে, সবনিস আছে । কেউ কাউকে দেখতে পারে না, খালি কামড়াকামড়ি করে ।


তাই নাকি ? কামড়াকামড়ি করে তুমি জানলে কী করে ? দুর্গে গিয়েছ নাকি ?
না । দুর্গে কাউকে ঢুকতে দেয় না । গাঁয়ের মাতব্বরেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, তাই শুনেছি । আমি স-ব জানি ।
সদাশিব আন্দাজে দুর্গের ব্যাপার বুঝেই নিল ...
দুর্গের তিনজন মালিকের মধ্যে কেবল একজনের সঙ্গে শিবাজির লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি লেখালেখি চলছে । অন্য দুজনে কিছু জানে না, কিন্তু তারা ফিরঙ্গজিকে সন্দেহ করে । এ অবস্থায় শিবাজির চিঠি জায়গামতো পৌঁছে দেওয়া কঠিন কাজ । কিন্তু দিতেই হবে,
যেমন করেই হোক চিঠি পৌঁছে দিতেই হবে !
এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে ....
ভাই সহস্রবুদ্ধি, তুমি ভারী বুদ্ধিমান । আমার জন্যে একটা কাজ করবে ?
বলো না, বলো ! তুমি যা বলবে তাই করব, আমি সব কাজ করতে পারি ।
গাঁয়ের সবাই আমায় পাগলা বলে খেপায়, শুধু এই ছোকরাই দেখছি আমার বুদ্ধির কদর বুঝেছে !

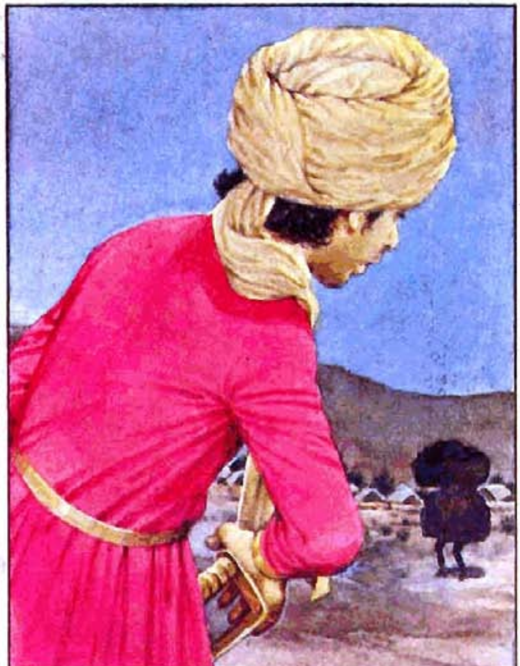

আমার বড় খিদে পেয়েছে। ঘোড়াটাও সারাদিন খায়নি। তুমি গাঁ থেকে জোয়ারের আটা আনতে পারবে ? আর কয়লা ? আমি পয়সা দেব।
নিশ্চয় আনতে পারি। চিন্তামন মুদির দোকানে আছে। দাও পয়সা।
সদাশিব তখন সহস্রবুদ্ধিকে কয়েকটা পয়সা দিয়ে বলল...
আর শোনো, বেশি করে কয়লা এনো, ঘোড়ার জন্যেও ভাকড়ি তৈরি করতে হবে। তা ছাড়া নুন চাই, জল চাই—
হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব আনব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।
সহস্রবুদ্ধি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল





(এর পরে আগামী সংখ্যায়





প্রকাণ্ড হাতির মতো একটা জন্তু এদিকেই এগিয়ে আসছে, হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে ! অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না । সদাশিব তলোয়ারের মুঠে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল ।

তারপর, একটু থেমেই, হঠাৎ জোর গলায় হেসে উঠল !

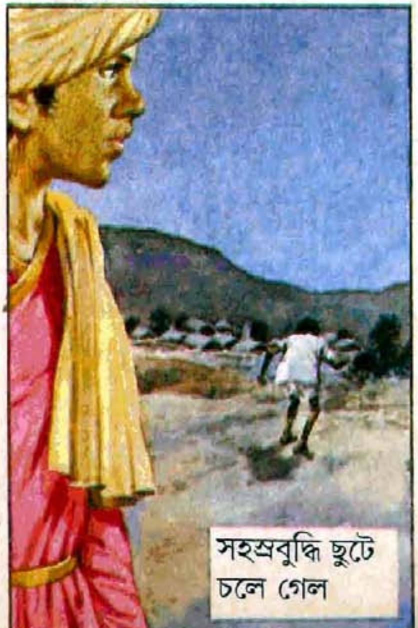






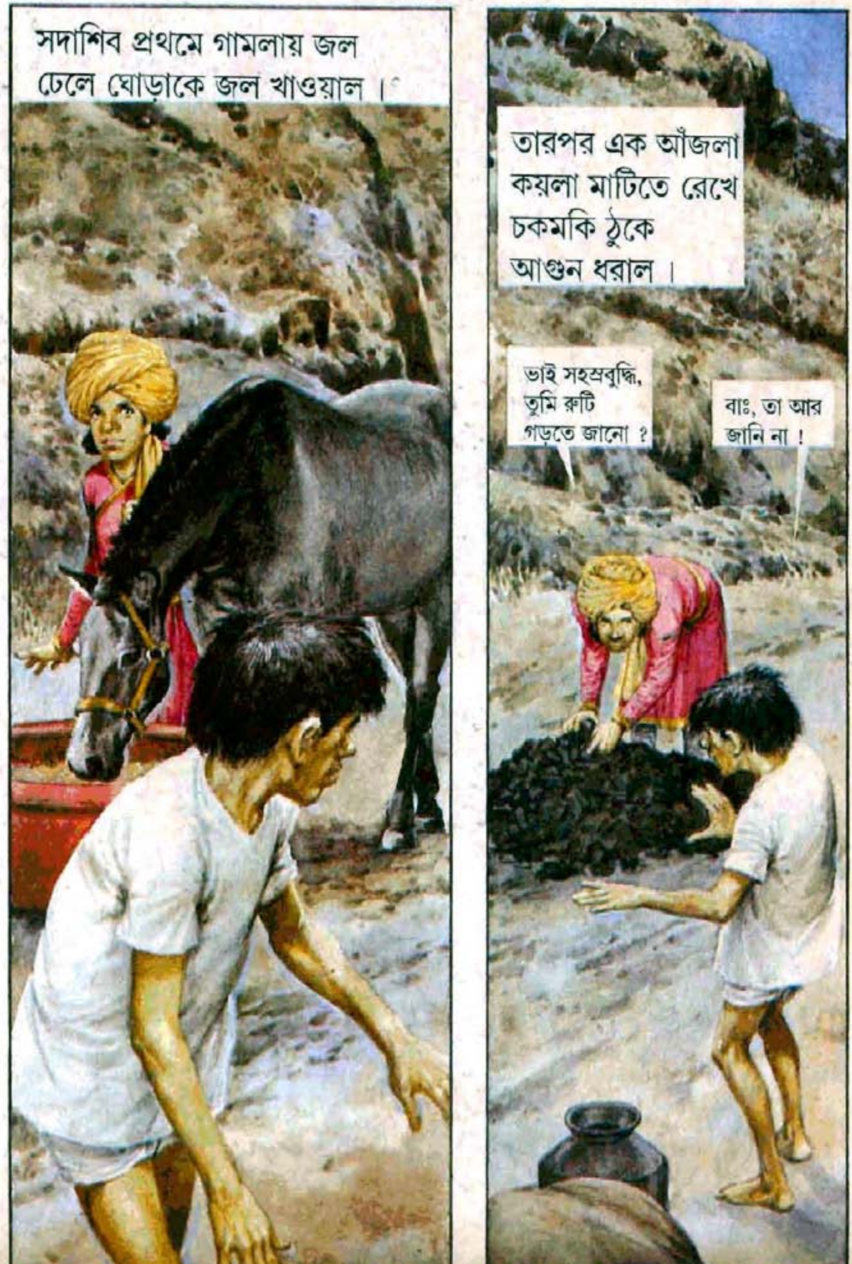
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)





আর একটু পরেই
গামলা নিয়ে ফিরে এল





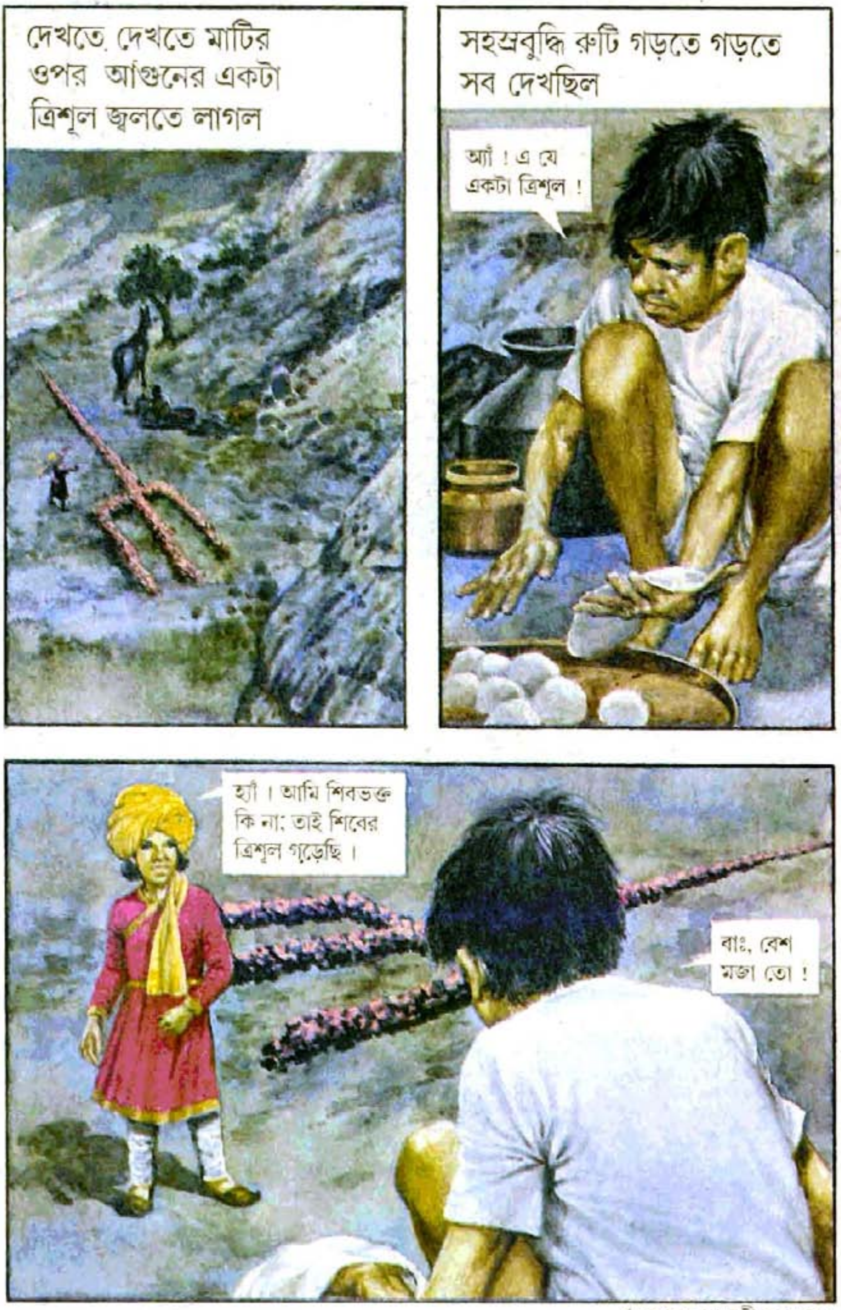
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



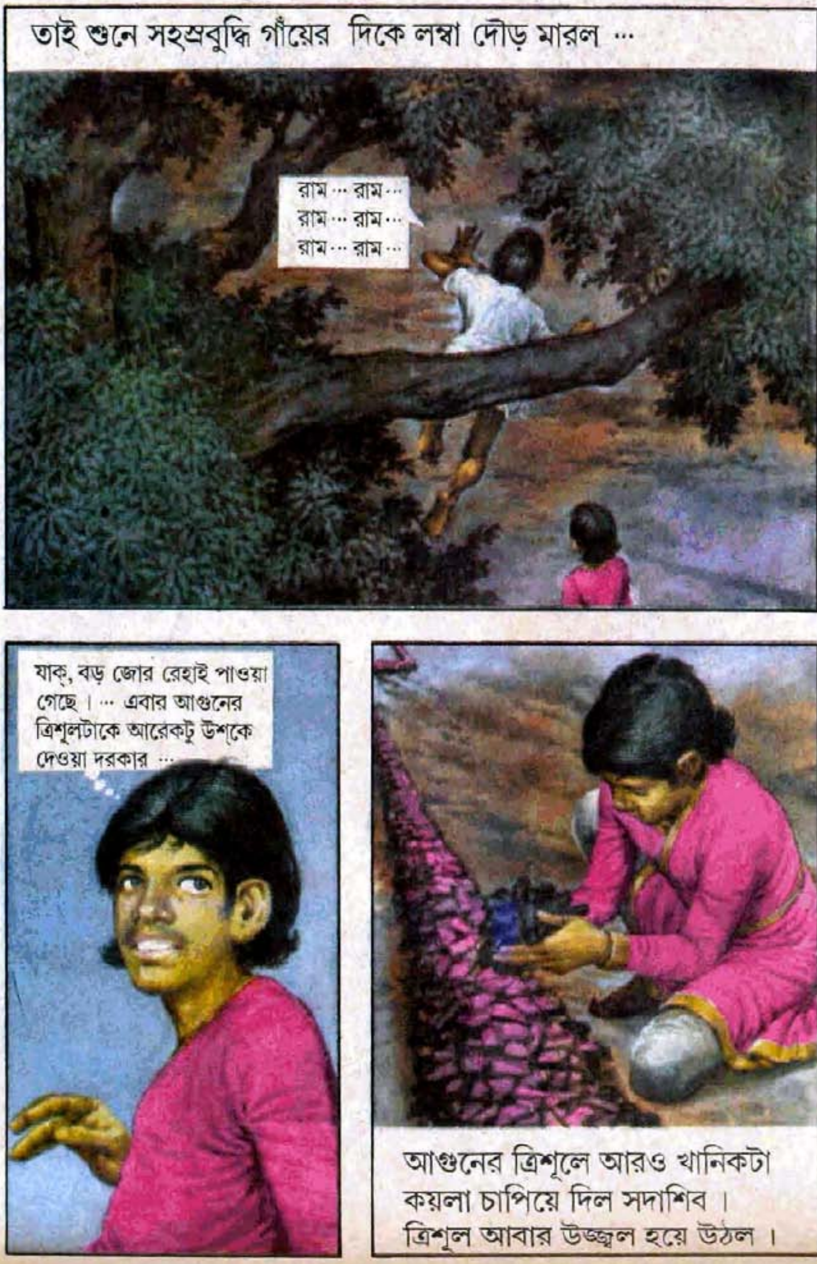
সহস্রবুদ্ধি আটা মেখে রুটি গড়তে বসল, সদাশিব দু'হাতে কয়লা নিয়ে মাটির ওপর লম্বালম্বি ভাবে সাজিয়ে রাখতে লাগল।





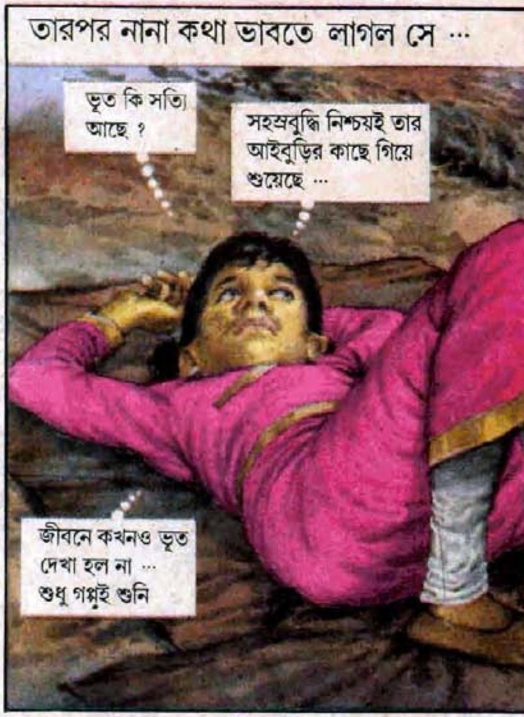


(এর পর আগামী সংখ্যায়)



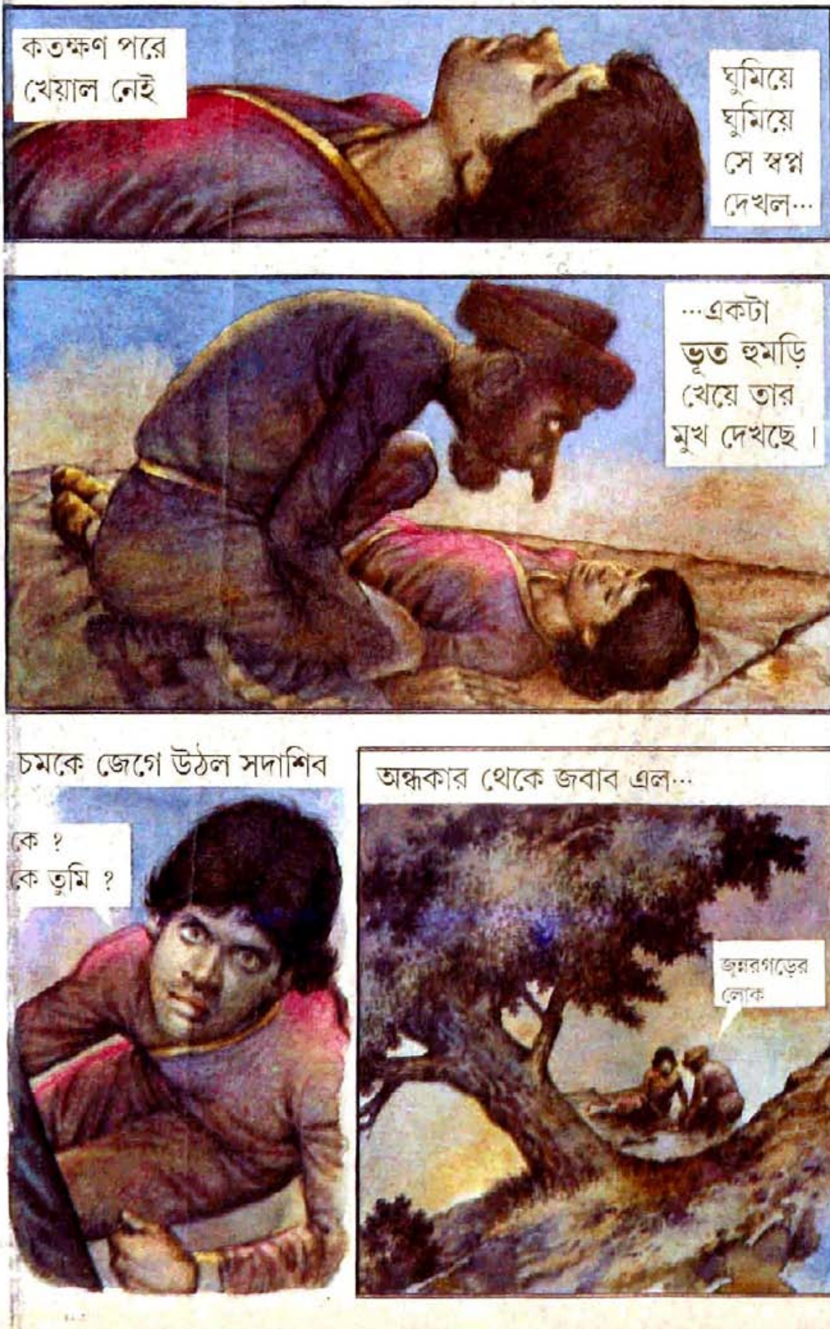
তাই শুনে সহস্রবুদ্ধি গাঁয়ের দিকে লম্বা দৌড় মারল ...
রাম ... রাম ... রাম ... রাম ... রাম ... রাম ...
যাক্, বড় জোর রেহাই পাওয়া গেছে। ... এবার আগুনের ত্রিশূলটাকে আরেকটু উশকে দেওয়া দরকার ...
আগুনের ত্রিশূলে আরও খানিকটা কয়লা চাপিয়ে দিল সদাশিব। ত্রিশূল আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।



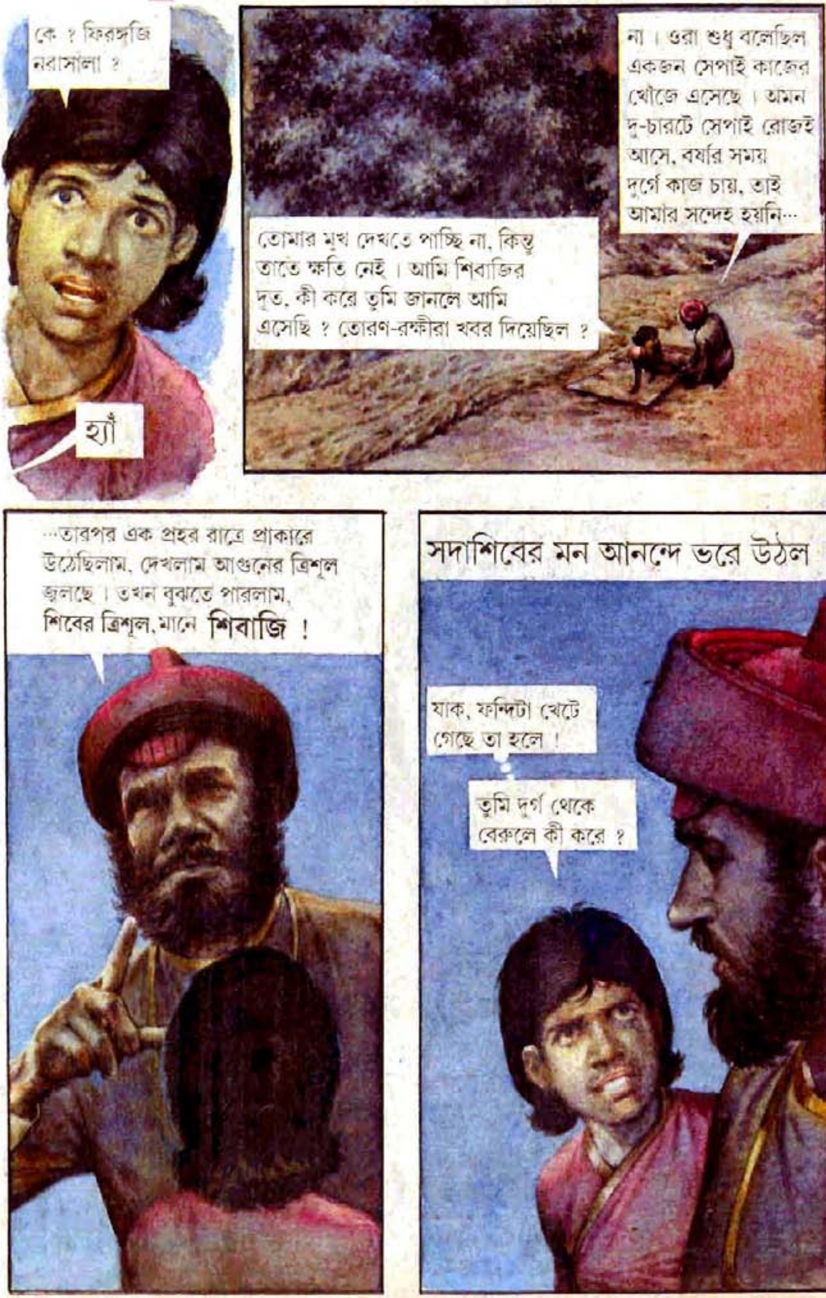




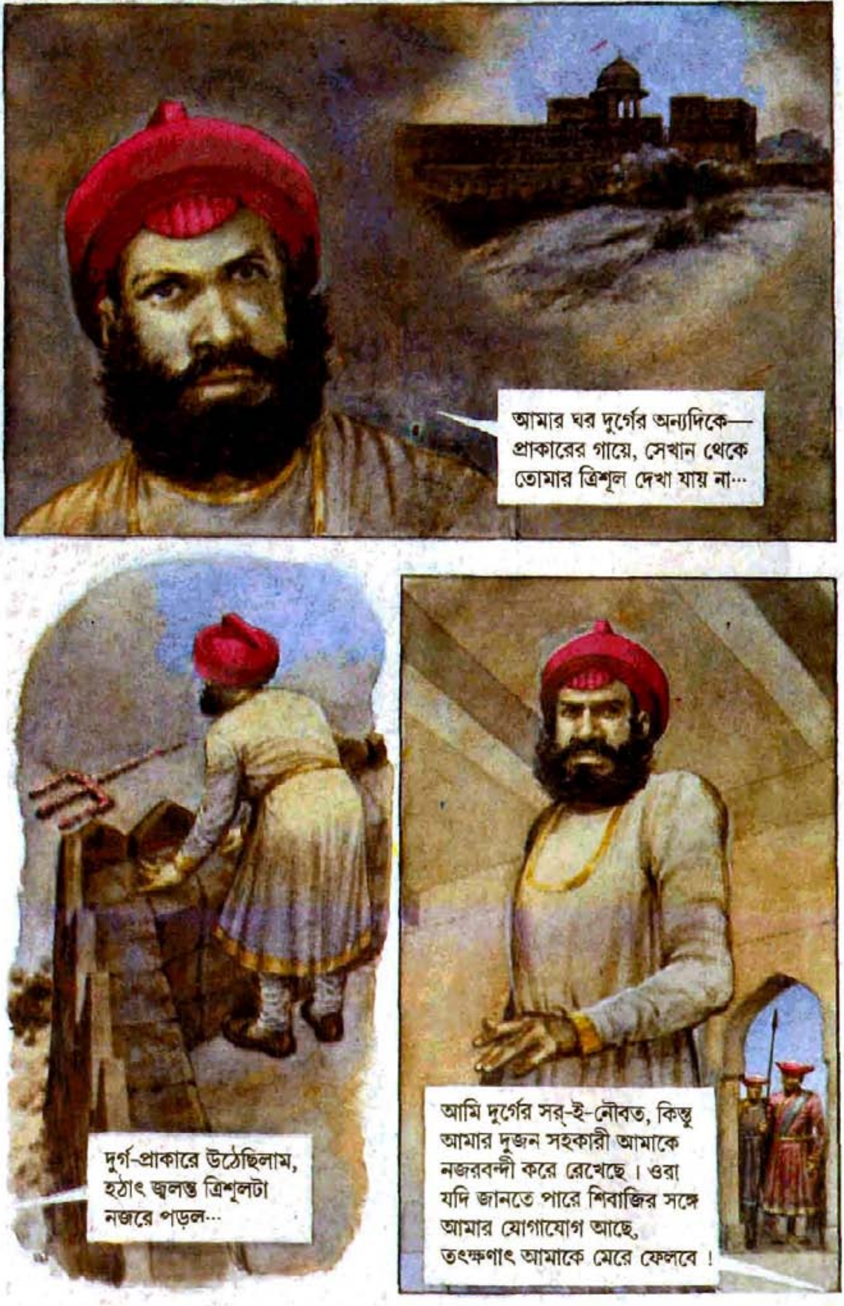
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

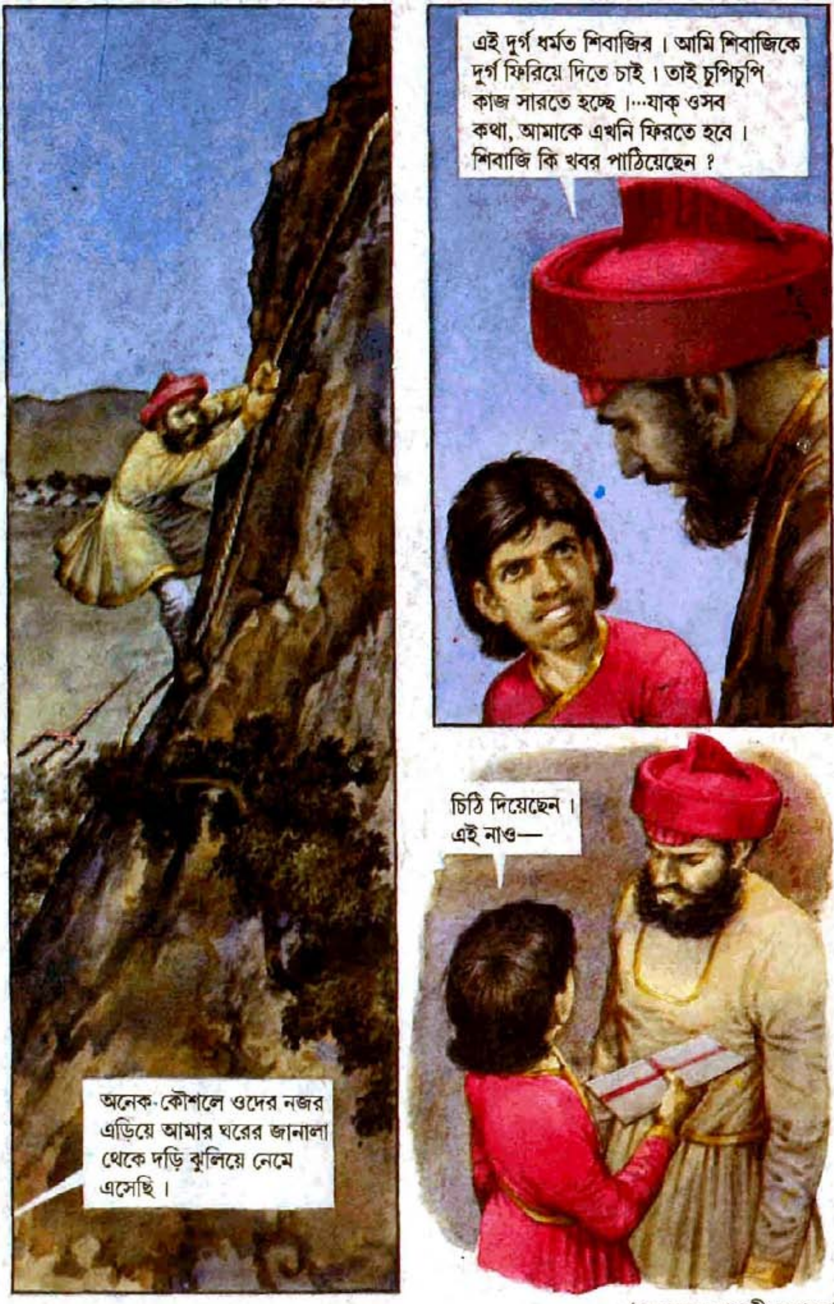


কতক্ষণ পরে খেয়াল নেই
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল…
…একটা ভূত হুমড়ি খেয়ে তার মুখ দেখছে।
চমকে জেগে উঠল সদাশিব
কে ? কে তুমি ?
অন্ধকার থেকে জবাব এল…
জম্মরগড়ের লোক

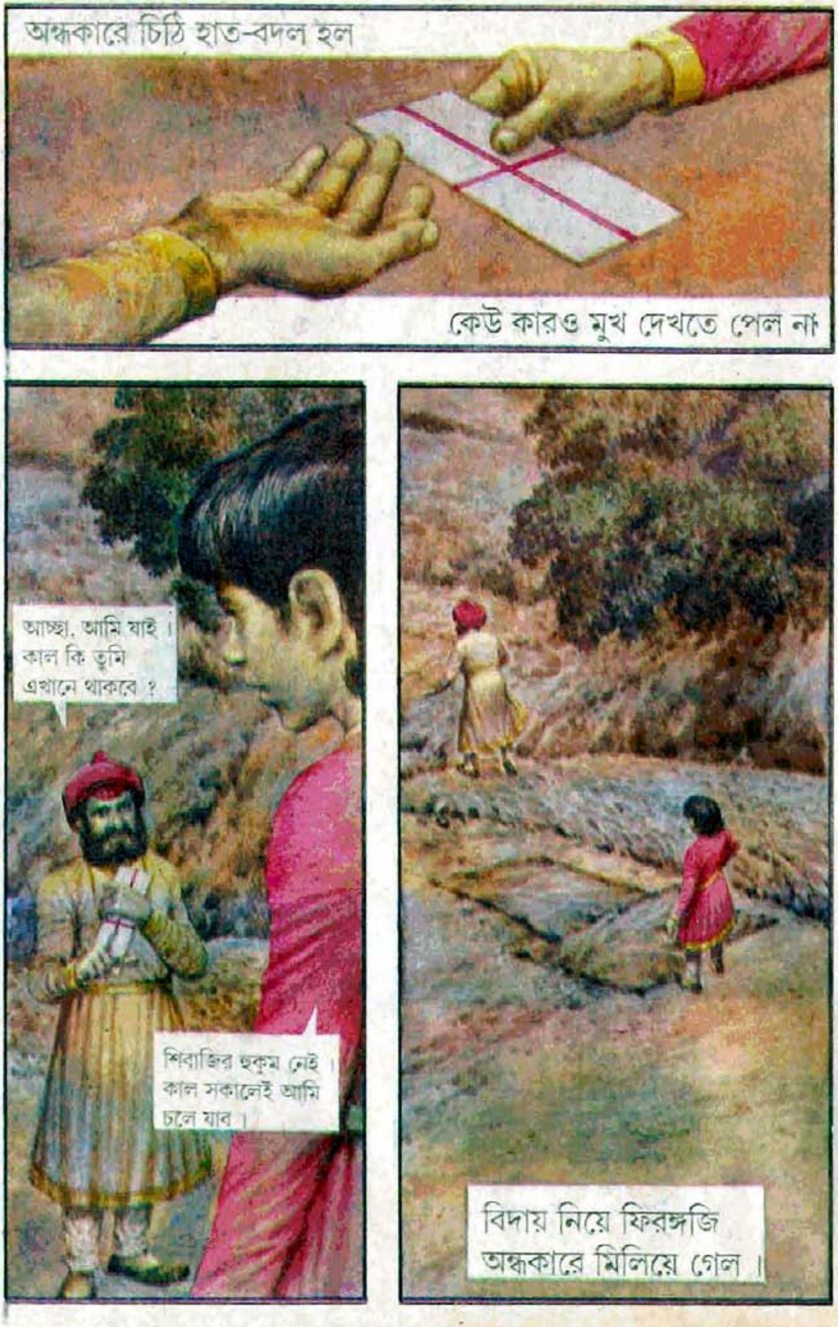


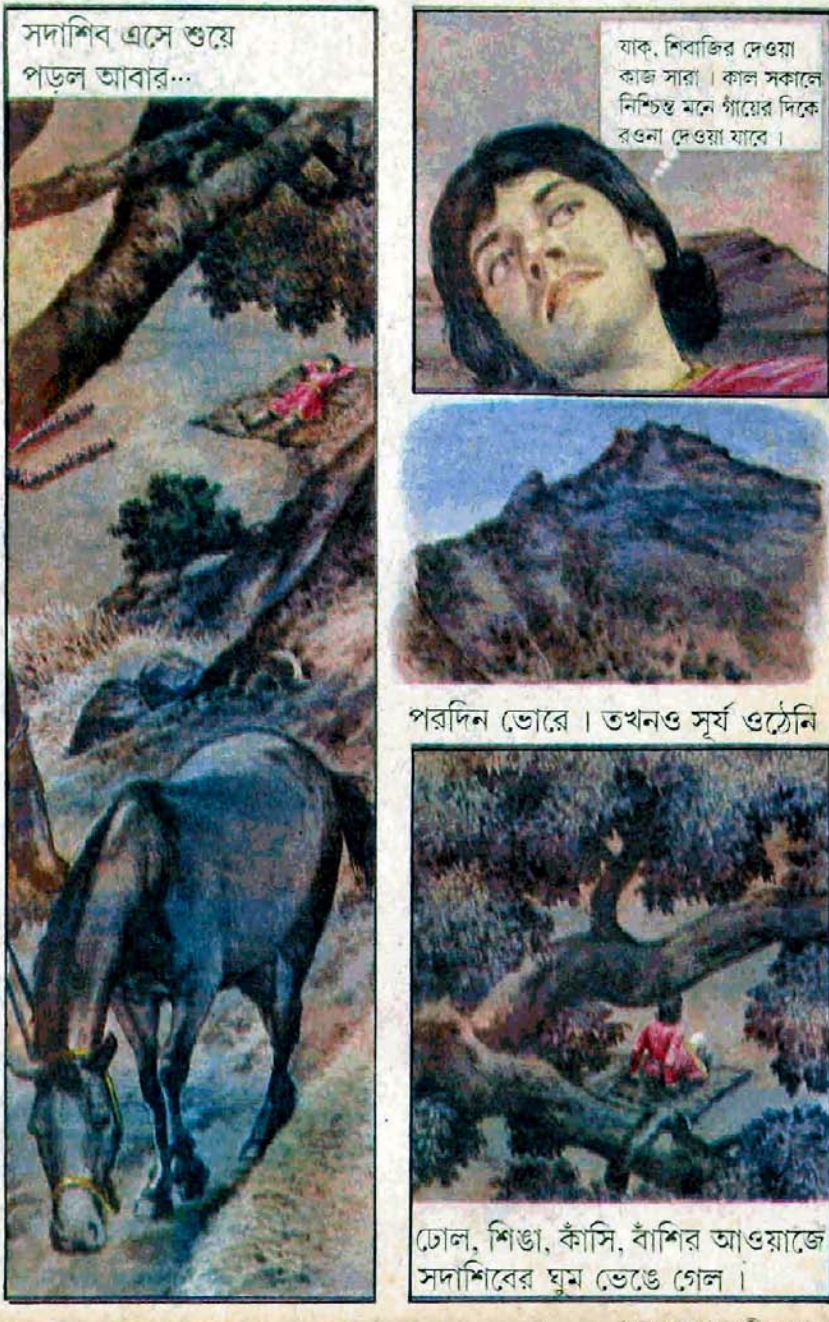
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


আমার ঘর দুর্গের অন্যদিকে—প্রাকারের গায়ে, সেখান থেকে তোমার ত্রিশূল দেখা যায় না···
দুর্গ-প্রাকারে উঠেছিলাম, হঠাৎ জ্বলন্ত ত্রিশূলটা নজরে পড়ল···
আমি দুর্গের সর্-ই-নৌবত, কিন্তু আমার দুজন সহকারী আমাকে নজরবন্দী করে রেখেছে। ওরা যদি জানতে পারে শিবাজির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, তৎক্ষণাৎ আমাকে মেরে ফেলবে !

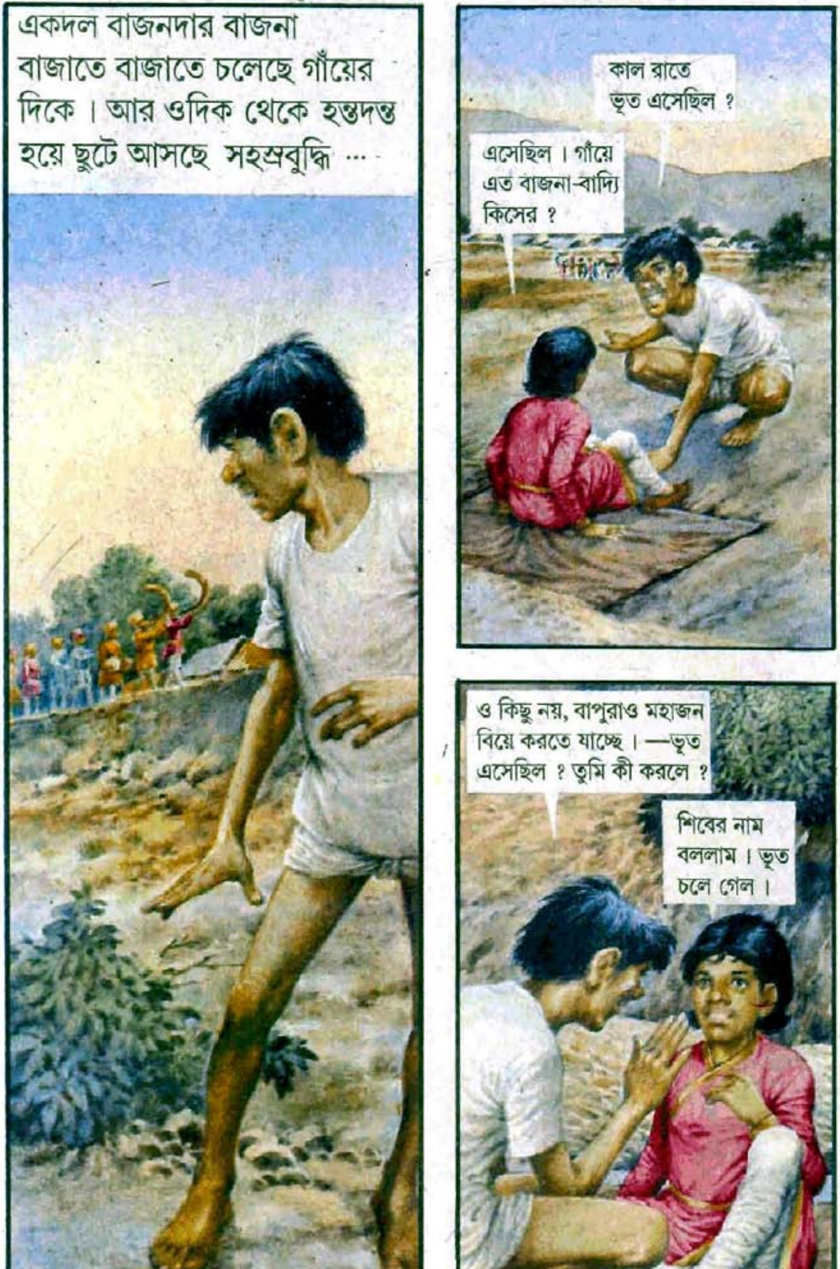


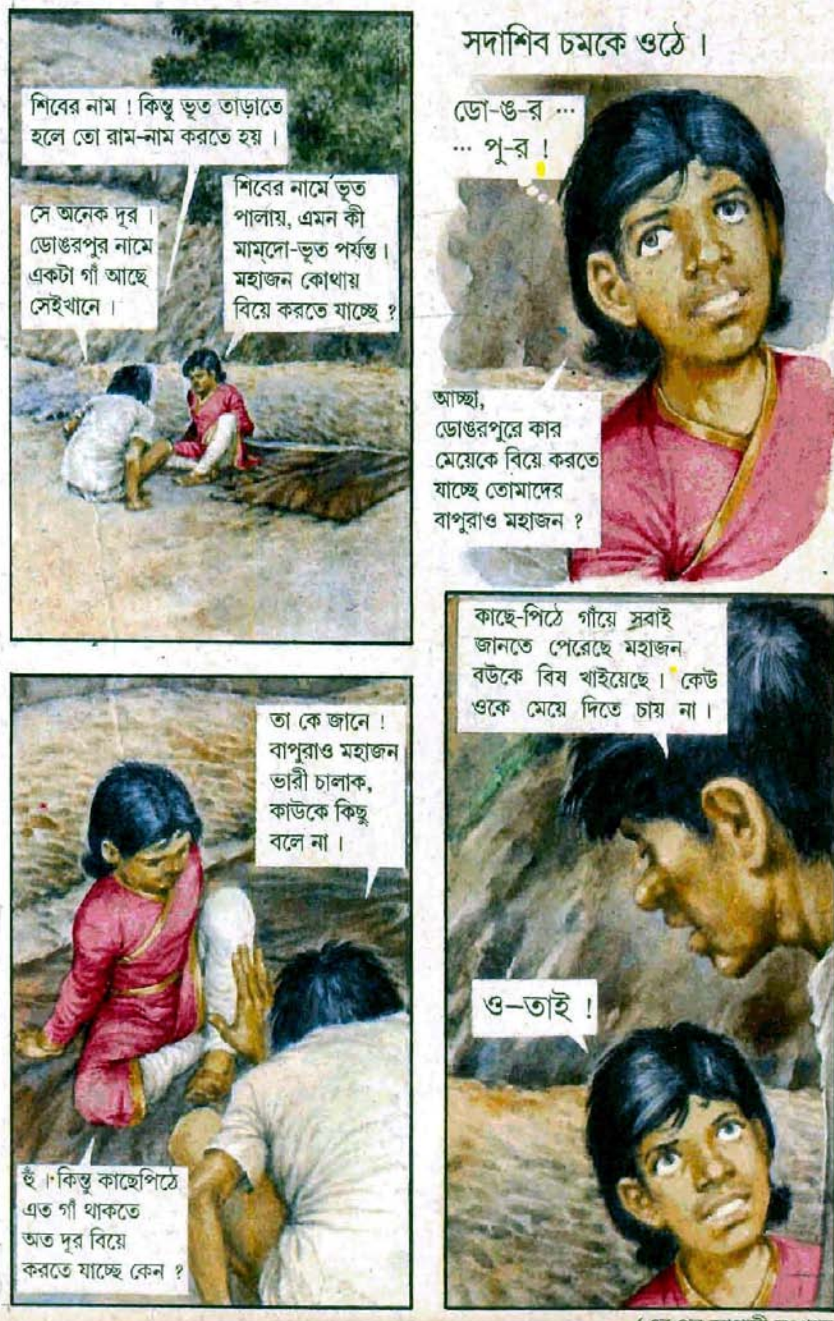
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

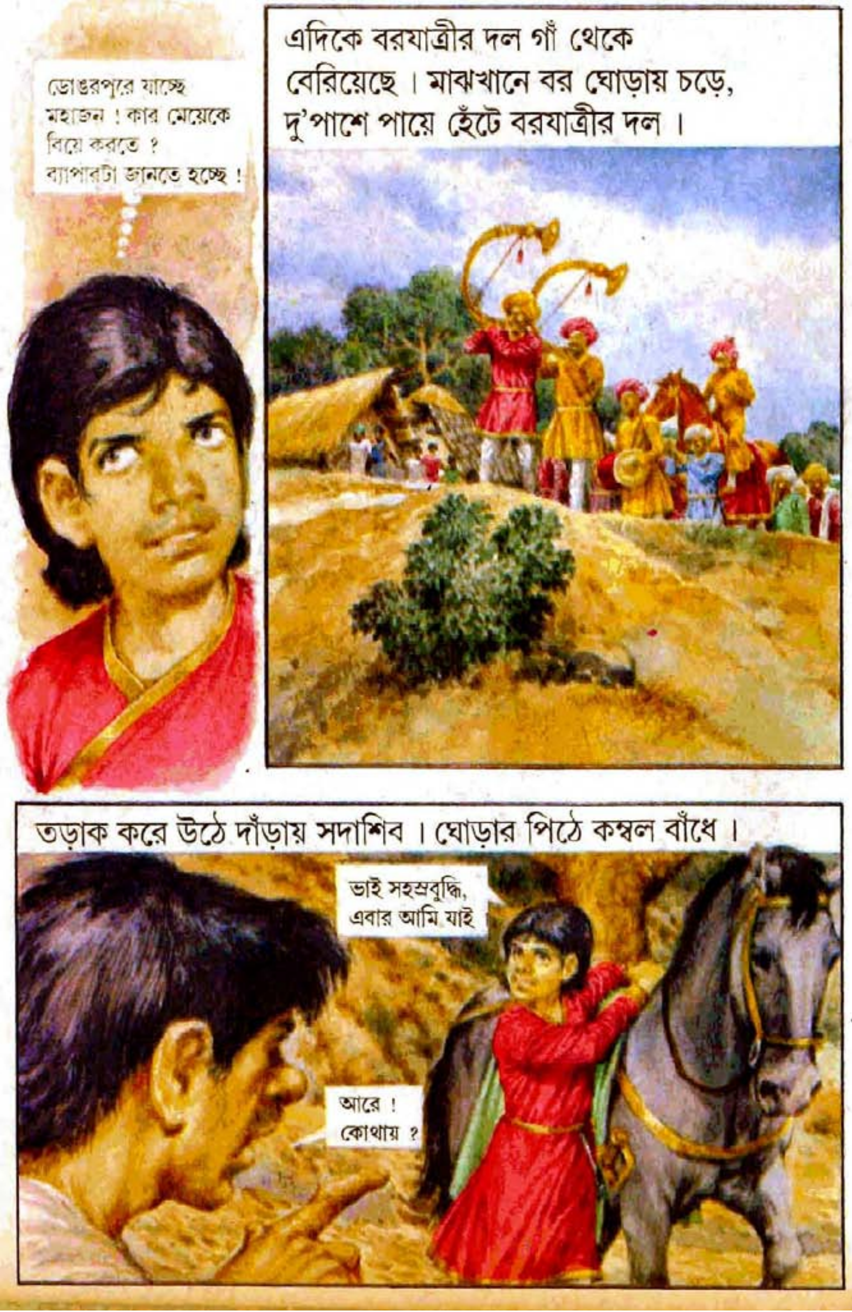

অন্ধকারে চিঠি হাত-বদল হল
কেউ কারও মুখ দেখতে পেল না
আচ্ছা, আমি যাই । কাল কি তুমি এখানে থাকবে ?
শিবাজির হুকুম নেই । কাল সকালেই আমি চলে যাব ।
বিদায় নিয়ে ফিরঙ্গজি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

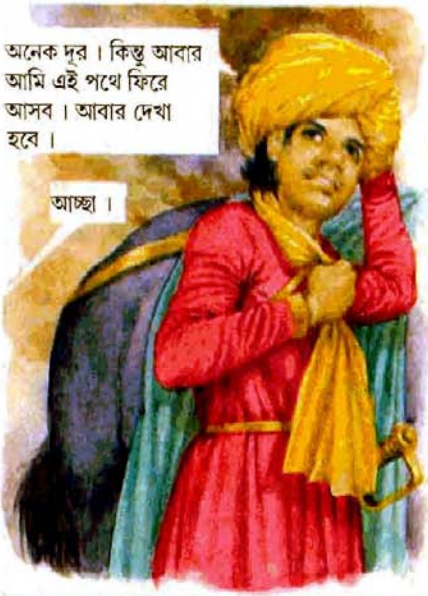

একদল বাজনদার বাজনা বাজাতে বাজাতে চলেছে গাঁয়ের দিকে । আর ওদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে সহস্রবুদ্ধি ...
কাল রাতে ভূত এসেছিল ?
এসেছিল । গাঁয়ে এত বাজনা-বাদ্যি কিসের ?
ও কিছু নয়, বাপুরাও মহাজন বিয়ে করতে যাচ্ছে । —ভূত এসেছিল ? তুমি কী করলে ?
শিবের নাম বললাম । ভূত চলে গেল ।

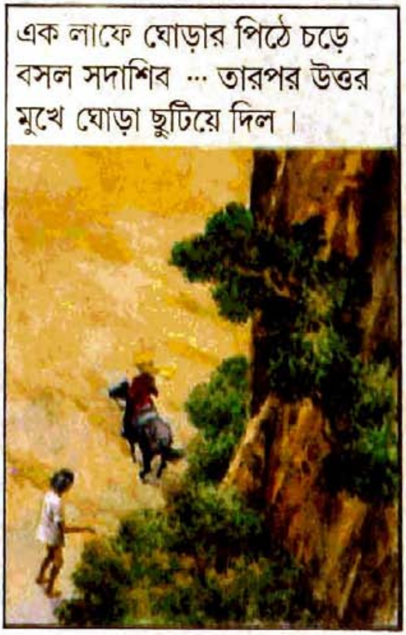

শিবের নাম ! কিন্তু ভূত তাড়াতে হলে তো রাম-নাম করতে হয় ।
শিবের নামে ভূত পালায়, এমন কী মামদো-ভূত পর্যন্ত । মহাজন কোথায় বিয়ে করতে যাচ্ছে ?
সে অনেক দূর । ডোঙরপুর নামে একটা গাঁ আছে সেইখানে ।
সদাশিব চমকে ওঠে ।
ডো-ঙ-র ... ... পু-র !
আচ্ছা, ডোঙরপুরে কার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তোমাদের বাপুরাও মহাজন ?
তা কে জানে ! বাপুরাও মহাজন ভারী চালাক, কাউকে কিছু বলে না ।
হুঁ । কিন্তু কাছেপিঠে এত গাঁ থাকতে অত দূর বিয়ে করতে যাচ্ছে কেন ?
কাছে-পিঠে গাঁয়ে সবাই জানতে পেরেছে মহাজন বউকে বিষ খাইয়েছে । কেউ ওকে মেয়ে দিতে চায় না ।
ও-তাই !
(এর পর আগামী সংখ্যায়)

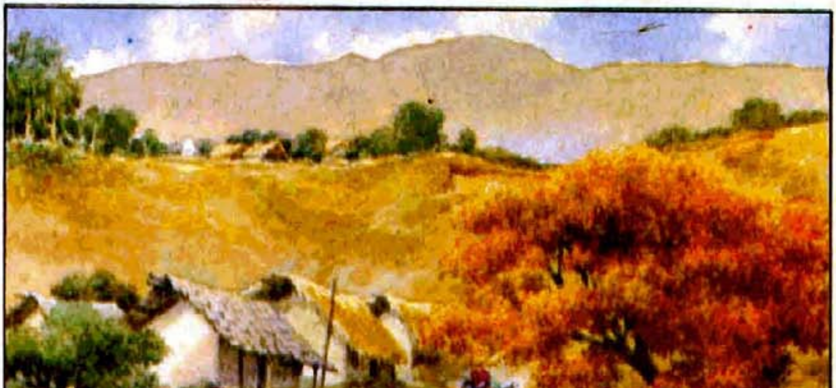


ডোঙরপুরে যাচ্ছে মহাজন ! কার মেয়েকে বিয়ে করতে ? ব্যাপারটা জানতে হচ্ছে !
এদিকে বরযাত্রীর দল গাঁ থেকে বেরিয়েছে । মাঝখানে বর ঘোড়ায় চড়ে, দু'পাশে পায়ে হেঁটে বরযাত্রীর দল ।
তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় সদাশিব । ঘোড়ার পিঠে কম্বল বাঁধে ।
ভাই সহস্রবুদ্ধি, এবার আমি যাই
আরে ! কোথায় ?

পাগড়ি বাঁধতে-বাঁধতে সদাশিব বলে







(এর পরে আগামী সংখ্যায়

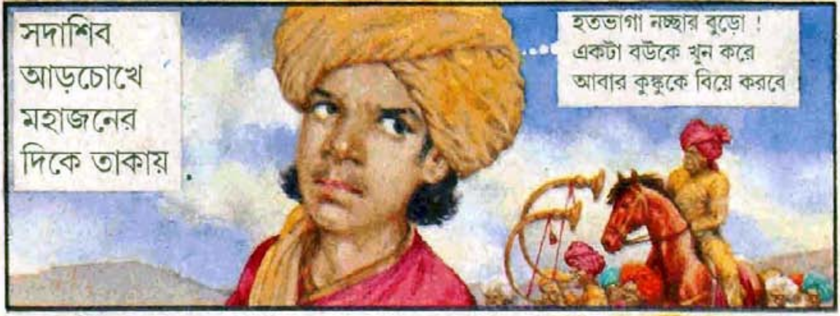

সদাশিবের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে বরযাত্রীরা পাশে সরে দাঁড়াল।
বাব্বা !···বরযাত্রীরা সবাই দেখছি বুড়ো আর হাড়-জিরজিরে। ···নির্ঘাত সব মহাজনের খাতক
আরে ! থামলে কেন ? চলো না খানিক দূর একসঙ্গে যাই।
বাপুরাও মহাজন—মর্কটের মতন চেহারা—সন্দেহের চোখে তাকায়।
তুমি সেপাই। কাল রাতে গ্রামের বাইরে মাঠে ছিলে ?
হ্যাঁ। কাজের খোঁজে এসেছিলাম··· চাকন দুর্গে হল না, তাই চলে যাচ্ছি।


কোথায় যাচ্ছ ?
জুন্নরগড়ে । দেখি সেখানে যদি কাজ পাই !
বরযাত্রীর দল আবার চলতে আরম্ভ করল । সদাশিবও তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলল ।
কিছুদূর চলবার পর সদাশিব মহাজনের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল···
শেঠ ! তোমার সাজপোশাক দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ । ঠিক কিনা ?

(এর পরে আগামী সংখ্যা

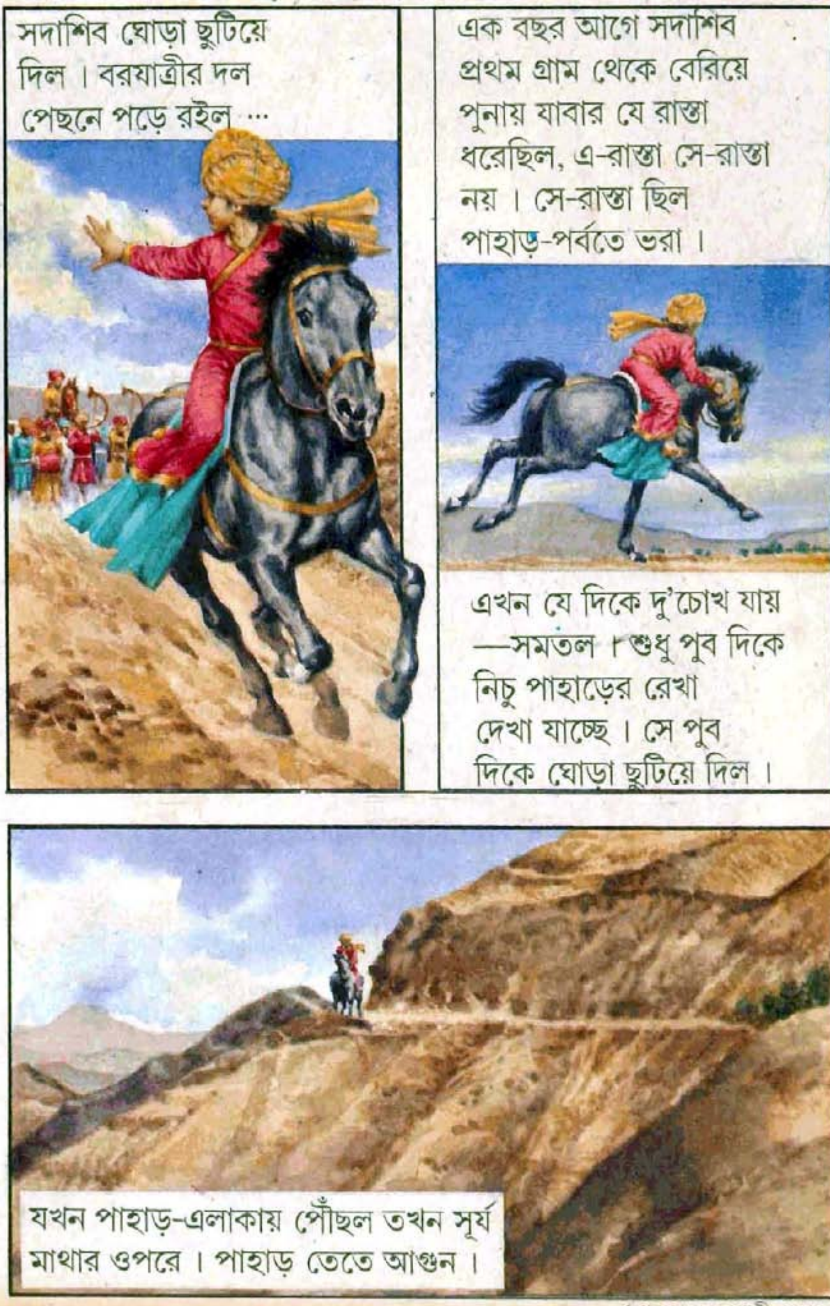

মহাজন সন্দিগ্ধ চোখে সদাশিবের দিকে তাকায় ।
এ-কথা জানতে চাইছে কেন ? কোনও মতলব-টতলব আছে নাকি ?
বরযাত্রীদের একজন মহাজনের দিকে চেয়ে বলল...
সেপাইকে বলতে দোষ কী ? ও তো আর গাঁয়ের পাজি লোক নয় যে ভাংচি দেবে !
হ্যাঁ গো সেপাই, শেঠজির বউ মারা গেছে তো, তাই নতুন বিয়ে করতে যাচ্ছে
বেশ, বেশ । শেঠজি দেখছি ভাগ্যবান পুরুষ । কথায় বলে, অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে ।...
তা কোথায় বিয়ে ?


সে অনেক দূর। আজ সারাদিন কাটবে, কাল বিকেলে গিয়ে পৌঁছবো। ডোঙরপুর গাঁয়ের নাম শুনেছ ?
ডোঙরপুর !!
হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বইকী ! দু'একজন লোকের নামও জানি। বিঠ্ঠল পাটিল—
আরে, ওই বিঠ্ঠল পাটিলের মেয়ের সঙ্গেই তো বিয়ে।
চমকে ওঠে সদাশিব
তার মানে ?
কুঙ্কু !!
কুঙ্কু ছাড়া তো বিঠ্ঠল পাটিলের অন্য মেয়ে নেই !
তবে কি কুঙ্কুকেই বিয়ে করতে চলেছে মহাজন ?!

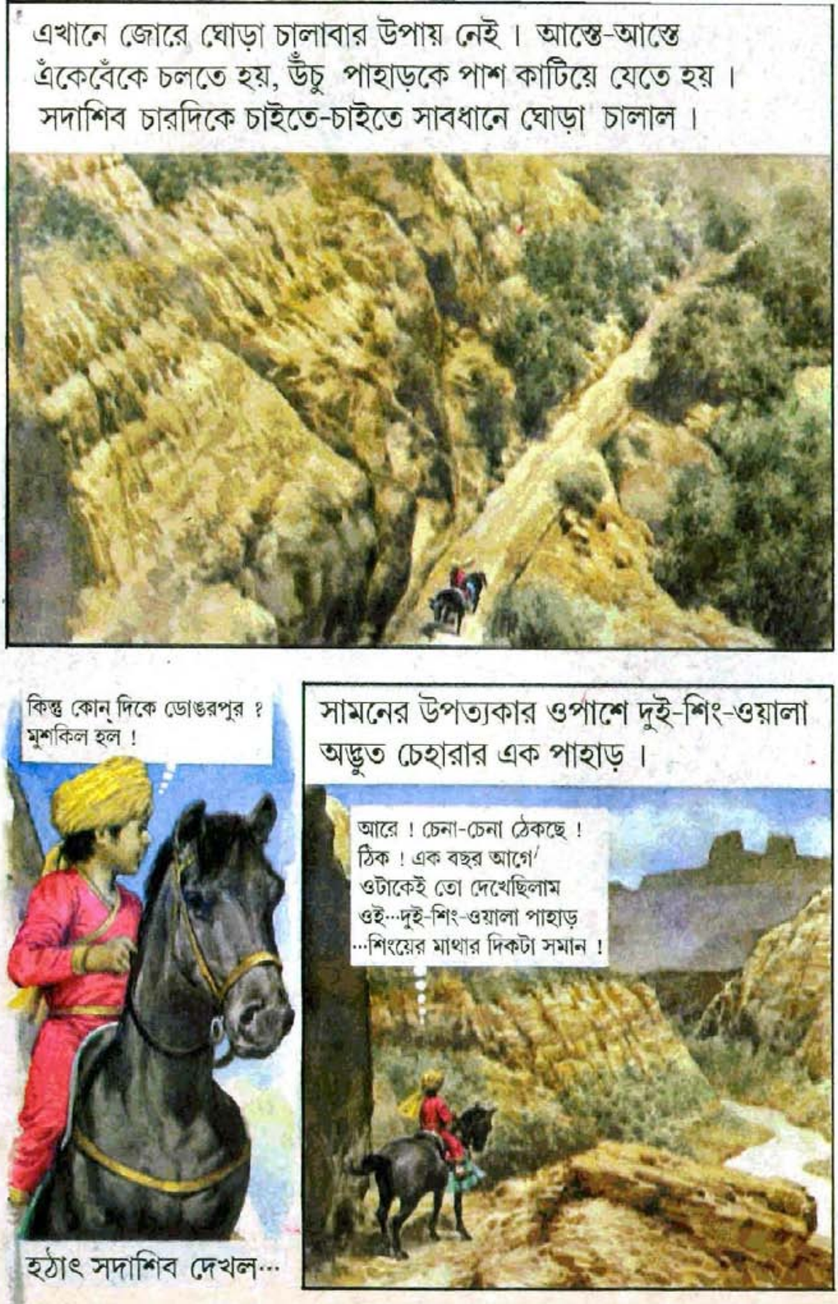

সদাশিব আড়চোখে মহাজনের দিকে তাকায়
হতভাগা নচ্ছার বুড়ো ! একটা বউকে খুন করে আবার কুঙ্কুকে বিয়ে করবে !


সদাশিবের রক্ত গরম হয়ে উঠল । ... এই কথা ! ওই মর্কটটা বিয়ে করবে কুঙ্কুকে !!
আর কেবল কুঙ্কুকে বিয়ে করতে যাচ্ছে এই অপরাধে কি একটা লোককে কোতল করা যায় ?
ইচ্ছে হচ্ছে, তলোয়ার বার করে বুড়োর মুণ্ডুটা কচাং করে কেটে নিই ...
রাস্তায় মারামারি কাটাকাটি শিবাজি পছন্দ করেন না ...
তা ছাড়া ওরা ছ'জন, আমি একা । ওদের সঙ্গে লাঠি বল্লম তলোয়ার আছে ...
কিন্তু না, মাথা গরম করলে চলবে না । ঠাণ্ডা ভাবে ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে ...
ঠিক আছে ! যে করে হোক, বরযাত্রীদের আগে গাঁয়ে পৌঁছে বিয়েটা ভণ্ডুল করে দিতে হবে । বিঠ্ঠল পাটিল নিশ্চয়ই টাকার লোভে বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু সে যখন জানতে পারবে মহাজন একটা বউকে বিষ খাইয়ে মেরেছে—

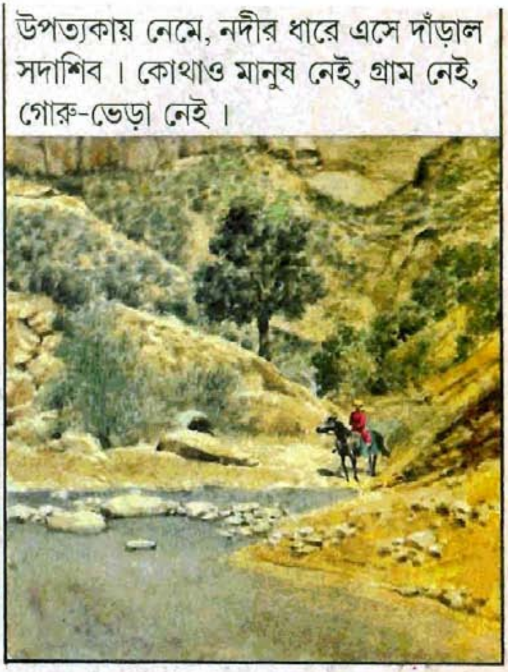

মুখে হাসি এনে সদাশিব বলল ...
বাঃ বাঃ, বেশ । আচ্ছা শেঠ, আমি চললাম । তাড়াতাড়ি না গেলে বেলা থাকতে জুন্নরগড়ে পৌঁছতে পারব না ।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


এখানে জোরে ঘোড়া চালাবার উপায় নেই। আস্তে-আস্তে এঁকেবেঁকে চলতে হয়, উঁচু পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। সদাশিব চারদিকে চাইতে-চাইতে সাবধানে ঘোড়া চালাল।
কিন্তু কোন্ দিকে ডোঙরপুর ? মুশকিল হল !
হঠাৎ সদাশিব দেখল···
সামনের উপত্যকার ওপাশে দুই-শিং-ওয়ালা অদ্ভুত চেহারার এক পাহাড়।
আরে ! চেনা-চেনা ঠেকছে ! ঠিক ! এক বছর আগে ওটাকেই তো দেখেছিলাম ওই···দুই-শিং-ওয়ালা পাহাড় ···শিংয়ের মাথার দিকটা সমান !


নীচের উপত্যকায় সরু নদীটাও দেখছি। ওর পাশেই প্রকাণ্ড জংলি জামগাছটা একবার খুঁজে পেলেই কেল্লা ফতে! গাঁয়ের পথ চিনতে আর কোনও কষ্ট হবে না।


উপত্যকায় নেমে, নদীর ধারে এসে দাঁড়াল সদাশিব। কোথাও মানুষ নেই, গ্রাম নেই, গোরু-ভেড়া নেই।


নে, পেট ভরে জল খা।



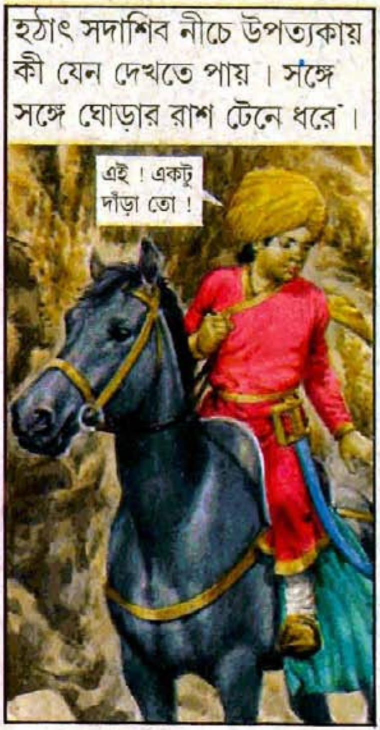


খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ওরা চলতে আরম্ভ করে

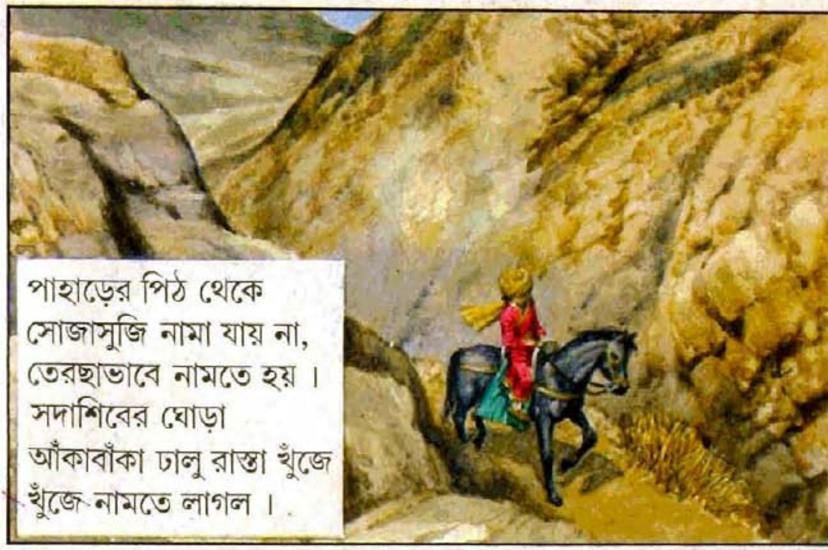
কিন্তু কোথায় ডোঙরপুর? এদিকে



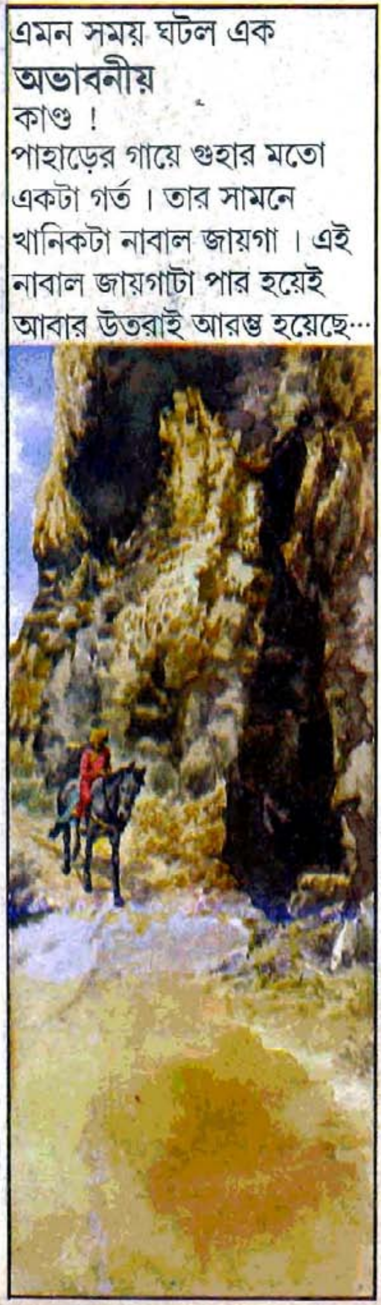
সূর্যও পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে।

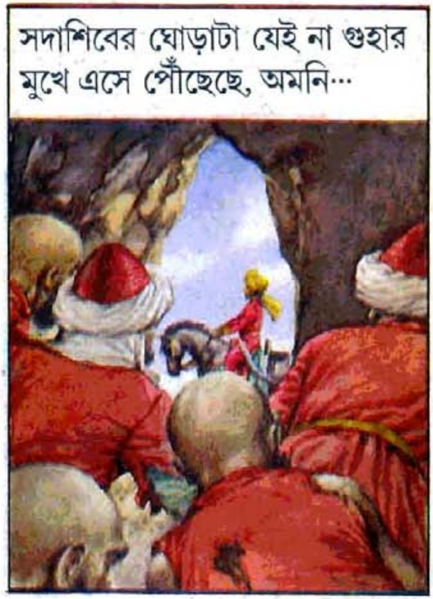






(এর পরে আগামী সংখ্যায়)





কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ গুহার ভেতর থেকে হা-রে-রে-রে বলে পাঁচটা লোক ছুটে বেরিয়ে এল ।



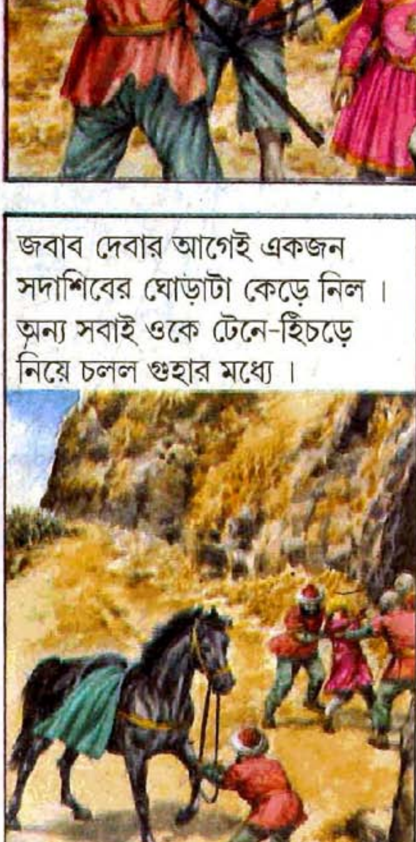


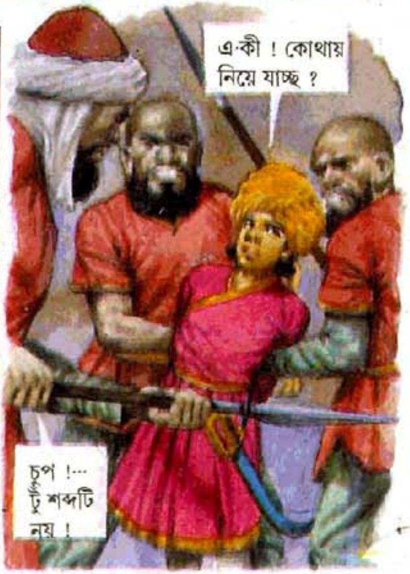
দেখতে দেখতে লোকগুলো সদাশিবকে ঘিরে দাঁড়াল।
নাম্ ঘোড়া থেকে!
অদ্ভুত চেহারা লোকগুলোর মুখ-ভরা দাড়ি, হিংস্র চোখ, পরনে ছেঁড়া-ফাটা মোগল সৈন্যদের পোশাক। কিন্তু সে পোশাকের কোনও জেল্লা নেই।
কারা এরা? মনে হচ্ছে, ডাকাত। নিশ্চয়ই মোগল সৈন্যদল থেকে বজ্জাতি করে পালিয়ে চারদিকে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে!
কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না।
কথা কানে যাচ্ছে না? নাম্ ঘোড়া থেকে!

সদাশিব গুটিগুটি নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে।
এত লোকের সঙ্গে তো গায়ের জোরে সে পেরে উঠবে না, বুদ্ধিবলে জিততে হবে। তাই কাঁদো-কাঁদো মুখ করে শুধোল—

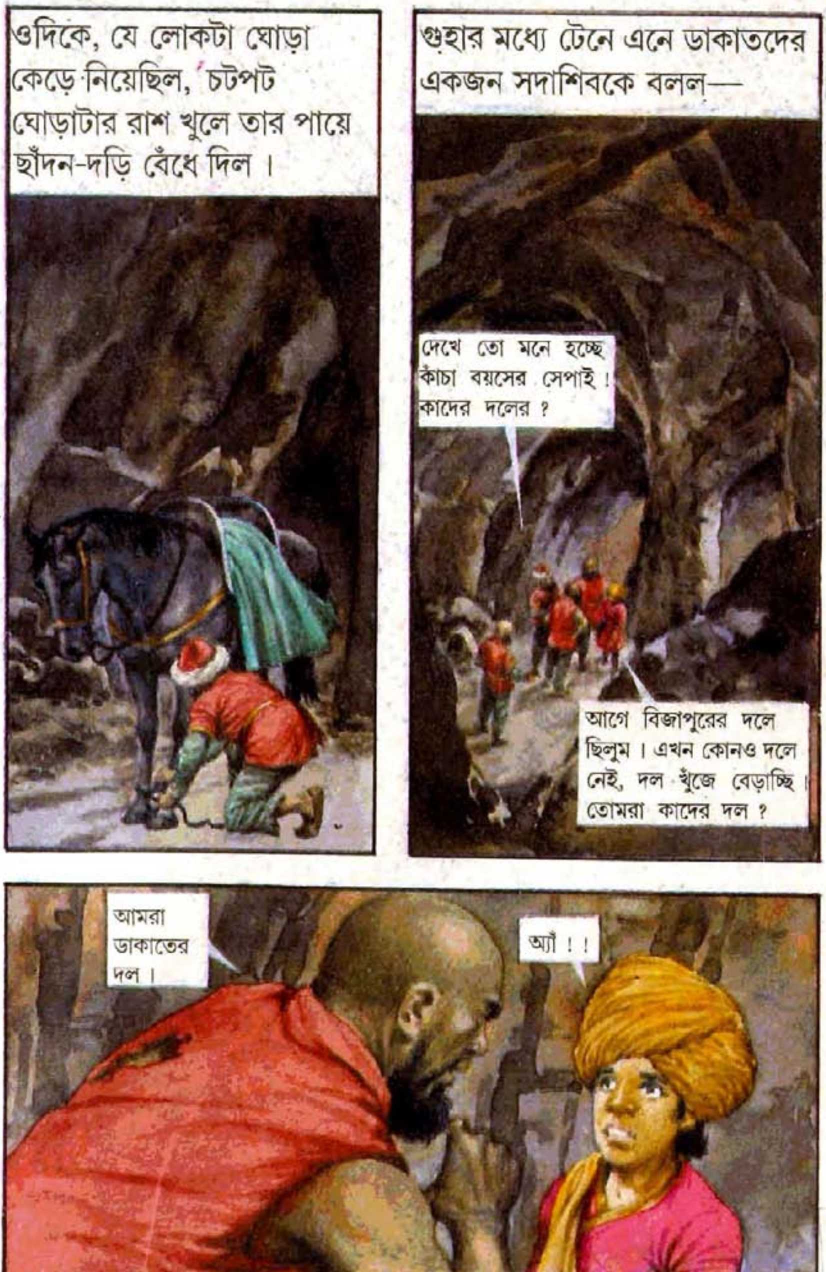


জবাব দেবার আগেই একজন সদাশিবের ঘোড়াটা কেড়ে নিল। অন্য সবাই ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল গুহার মধ্যে।

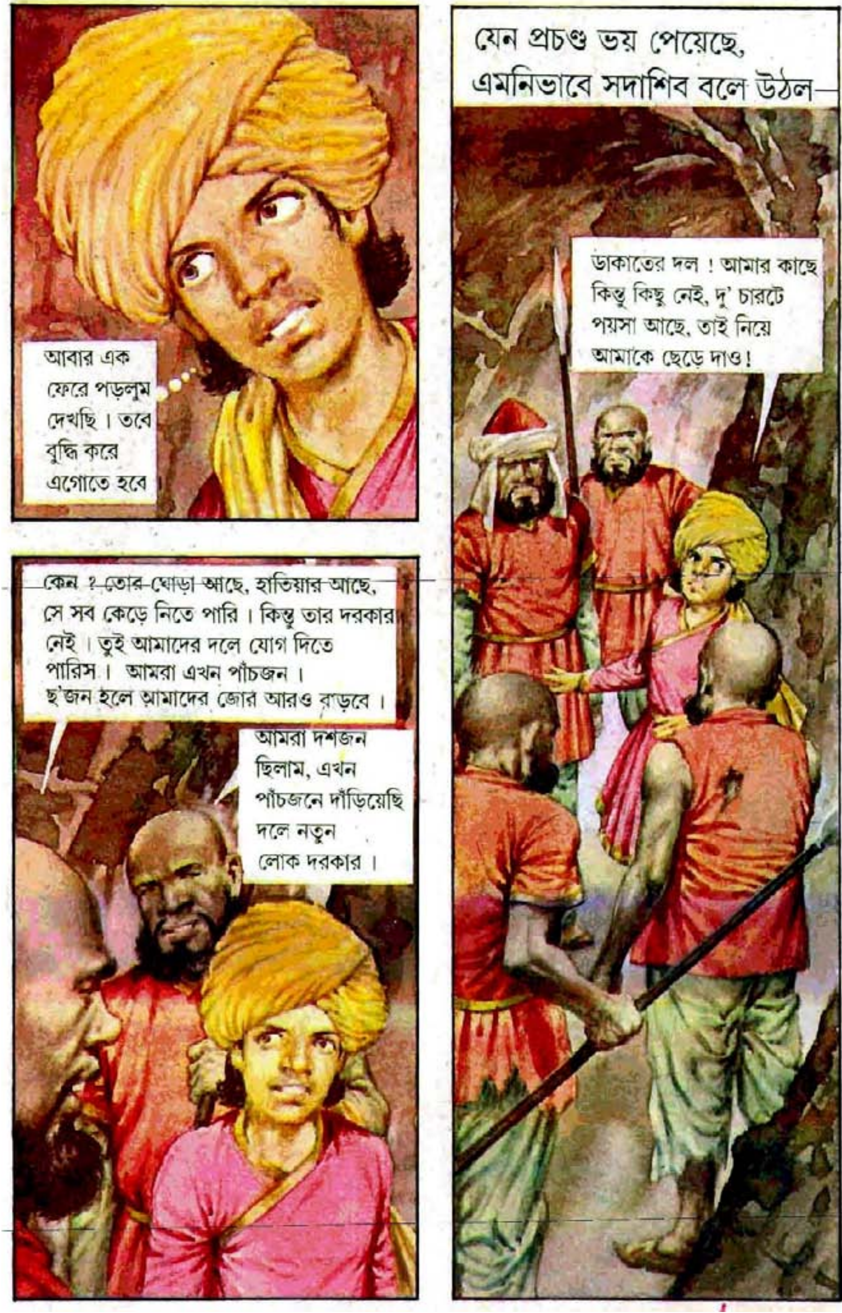




গুহার ভেতরটা ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। পাথরের ফাটল বেয়ে ঝিরঝির করে এখানে-ওখানে জল পড়ছে।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


আবার এক ফেরে পড়লুম দেখছি। তবে বুদ্ধি করে এগোতে হবে।
যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে, এমনিভাবে সদাশিব বলে উঠল—
ডাকাতের দল! আমার কাছে কিন্তু কিছু নেই, দু' চারটে পয়সা আছে, তাই নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও!
কেন? তোর ঘোড়া আছে, হাতিয়ার আছে, সে সব কেড়ে নিতে পারি। কিন্তু তার দরকার নেই। তুই আমাদের দলে যোগ দিতে পারিস। আমরা এখন পাঁচজন। ছ'জন হলে আমাদের জোর আরও বাড়বে।
আমরা দশজন ছিলাম, এখন পাঁচজনে দাঁড়িয়েছি দলে নতুন লোক দরকার।

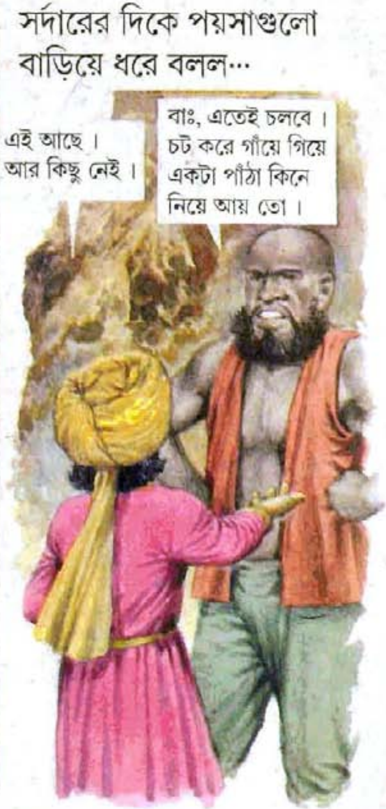


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

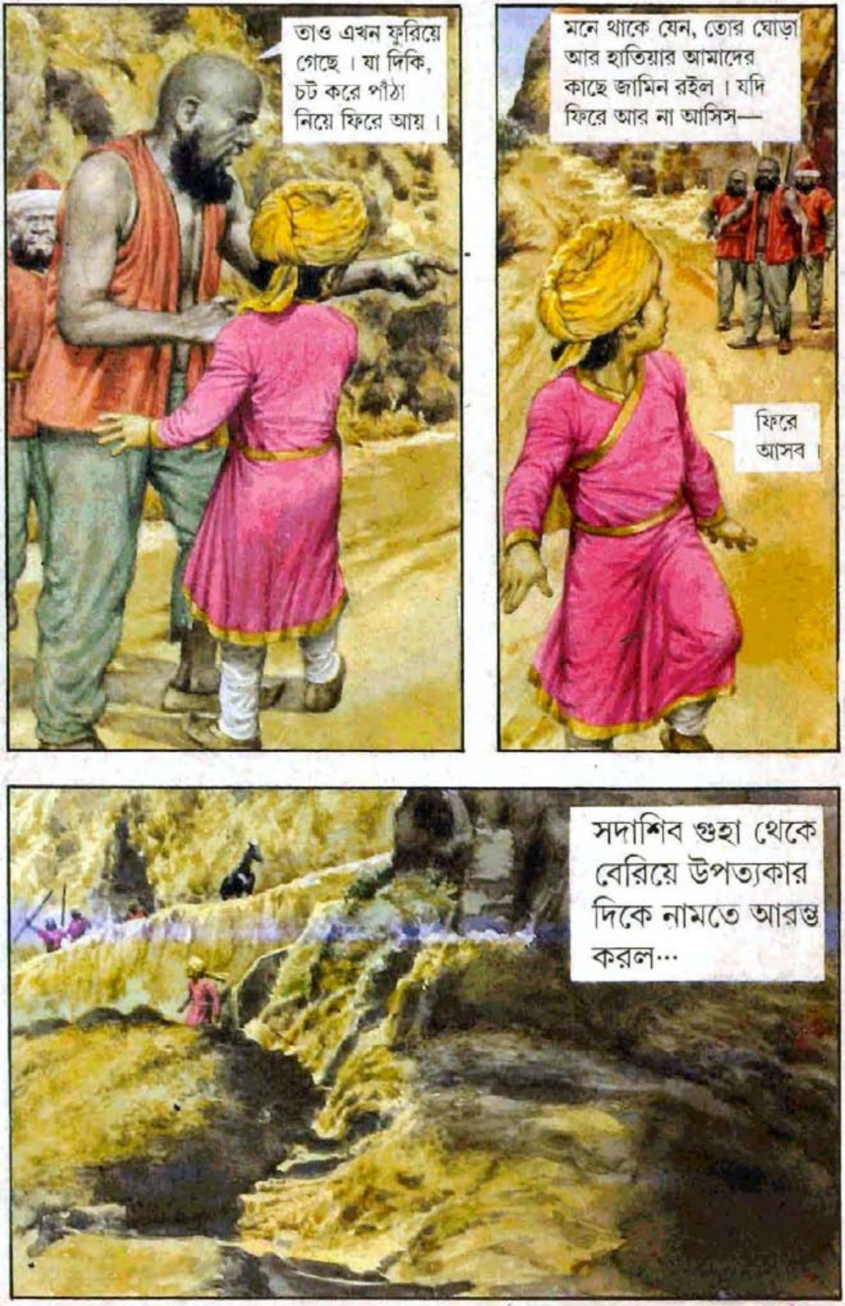

শাহজাদার কানে খবর উঠল, তিনি আমাদের কোতলের হুকুম দিলেন ।
তখন আর উপায় কী, দল ছেড়ে পালাতে হল ।
তারপর থেকে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছি । মনের সুখে আছি আমরা । কারও হুকুম মানি না, লুঠপাট করে নিজেদের মধ্যে সমান ভাগ করে নিই ।


ডাকাতের সর্দার এতক্ষণ একদৃষ্টে সদাশিবকে দেখছিল। এবার বলল—
আসবে আমাদের দলে ? লুঠের ভাগ পাবে।
সদাশিব ভাবনায় পড়ে গেল—
সোজাসুজি "না" বললে হয়তো ওরা আমাকে কেটেই ফেলবে। বুদ্ধি খাটাতে হবে।
করুণ সুরে সদাশিব বলল—
আমার তো খুবই লোভ হচ্ছে তোমাদের দলে যোগ দিই। কিন্তু আমি যে গ্রামে যাচ্ছি। আমার মা'র ভারী অসুখ, বোধহয় বাঁচবে না। তাই মাকে দেখতে যাচ্ছি। একবার দেখেই ফিরে আসব। তখন তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব। কেমন ? তোমরা এখানেই থাকবে তো ?
হুঁ। ছোঁড়ার বয়েস কম হলে কী হবে, বুদ্ধি আছে। কিন্তু ওসব বুদ্ধি আমার কাছে খাটবে না।


কোমর থেকে এক মুঠো পয়সা বার করে ফেলল সদাশিব ।
পয়সাগুলোর মায়া করে আর লাভ নেই । তবে আঙরাখার তলায় কুঙ্কুর জন্যে কেনা আংটিটার কথা, খর্বদার, বলা চলবে না ।

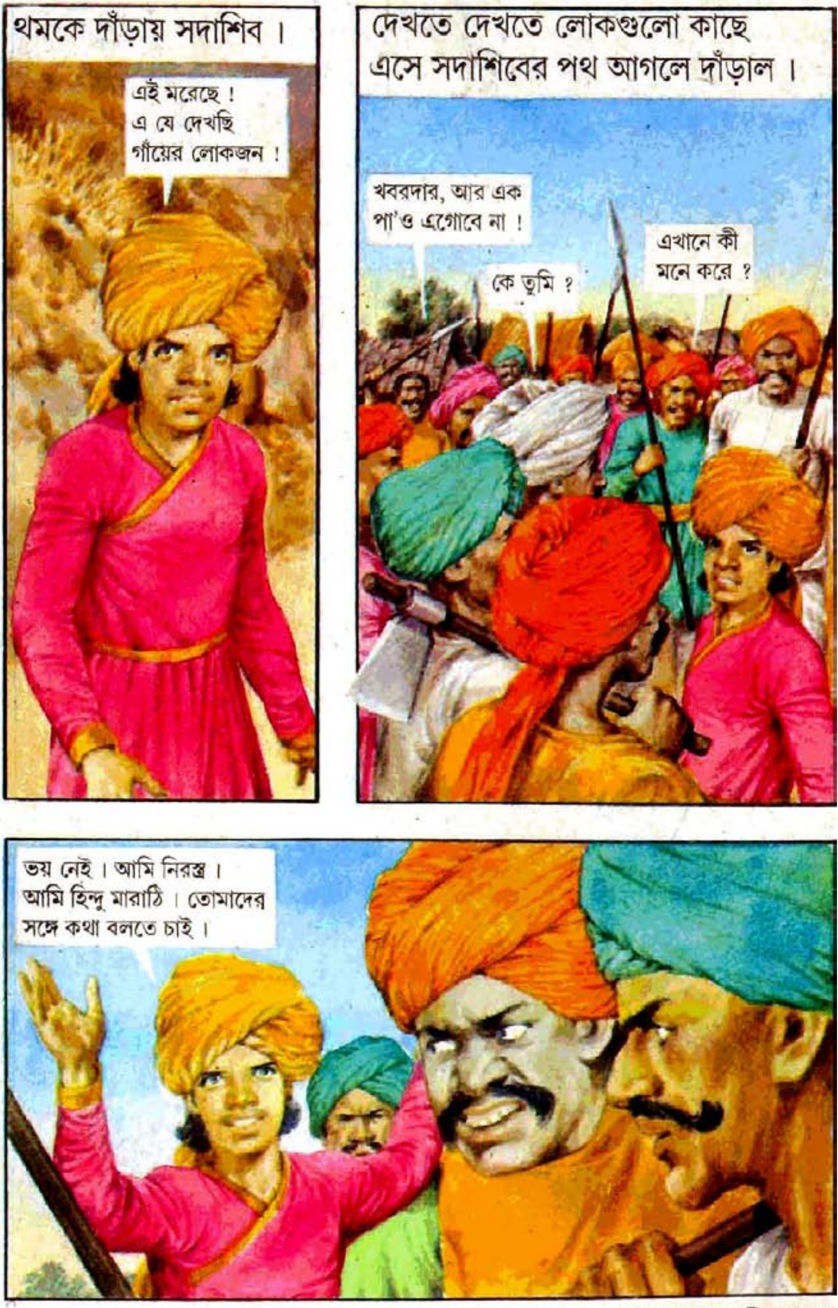

সর্দারের দিকে পয়সাগুলো বাড়িয়ে ধরে বলল…
এই আছে । আর কিছু নেই ।
বাঃ, এতেই চলবে । চট করে গাঁয়ে গিয়ে একটা পাঁঠা কিনে নিয়ে আয় তো ।


ডাকাত-দলের আর-লোকগুলো বলে উঠল…
হ্যাঁ, বেশ পুরুষ্টু নধর একটি পাঁঠা !
ওঃ, কদ্দিন যে গোস্ত খাইনি, কেবল শুকনো ছোলা আর ভুট্টা চিবিয়েছি !

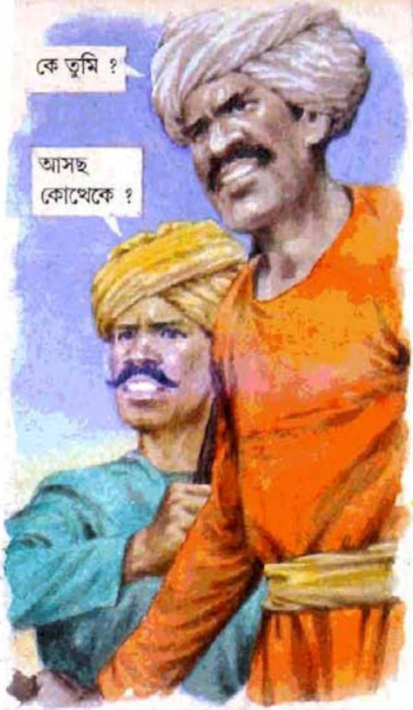


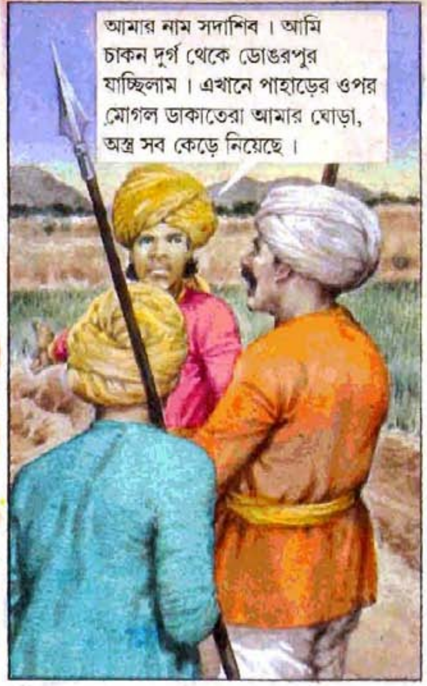
(এর পরে আগামী সংখ্যায়


সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের মাথায়
বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে···
হ্-র্-র্-র্-
নাকের শব্দ শুনিয়ে আর কী করবে বাবা ? পায়ে যে তোমার ছাঁদন-দড়ি বাঁধা !
পাহাড় থেকে নেমে এল সদাশিব ।
গাঁয়ের সীমানায় পা দিয়েছে···
হঠাৎ···
খবরদার !
পাকড়ো !
পাকড়ো !
গাঁয়ের দিক থেকে লাঠিসোটা হাতে তেড়ে এল একদল লোক । প্রায় জনা-চল্লিশ-পঞ্চাশ হবে ।

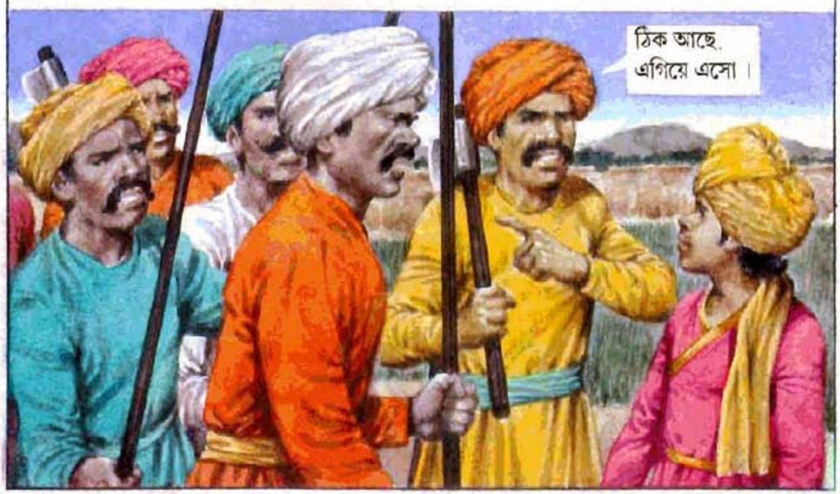


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



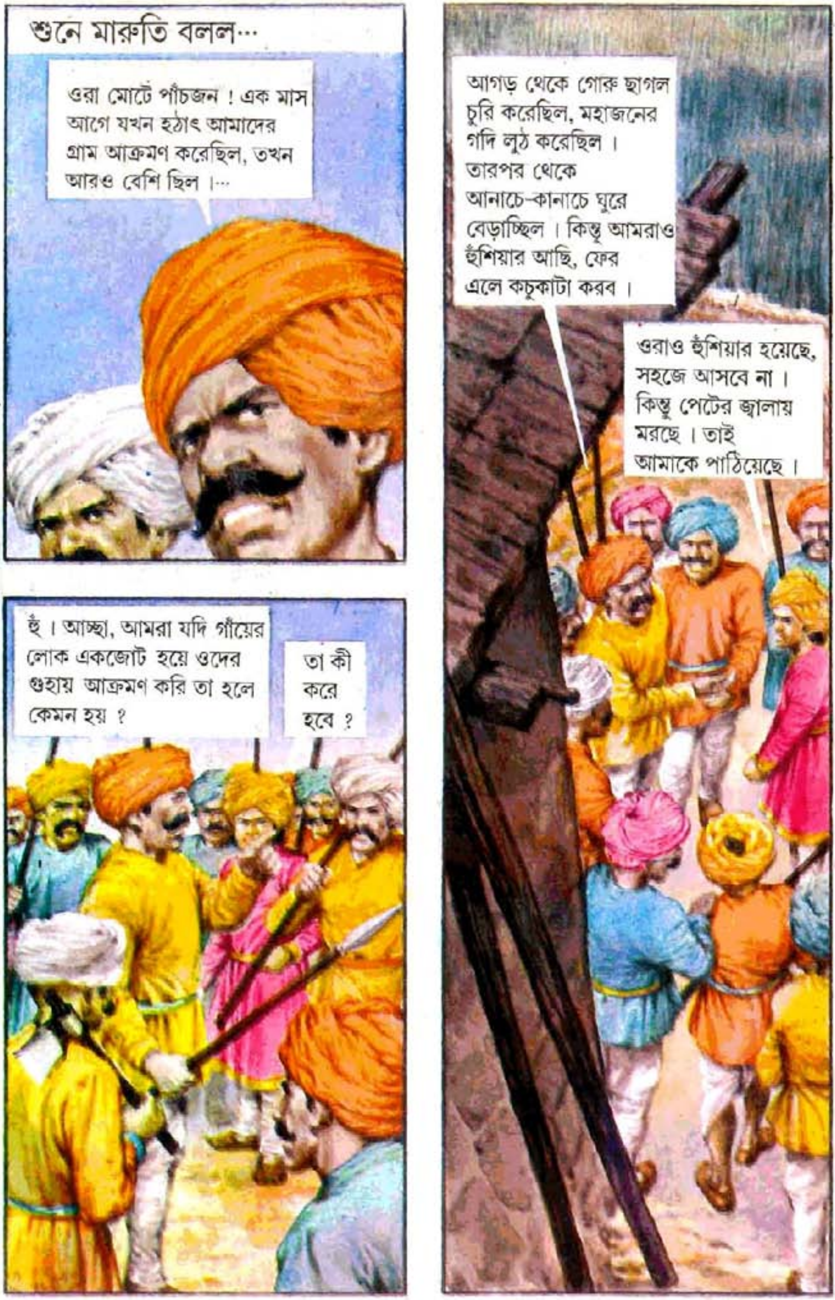


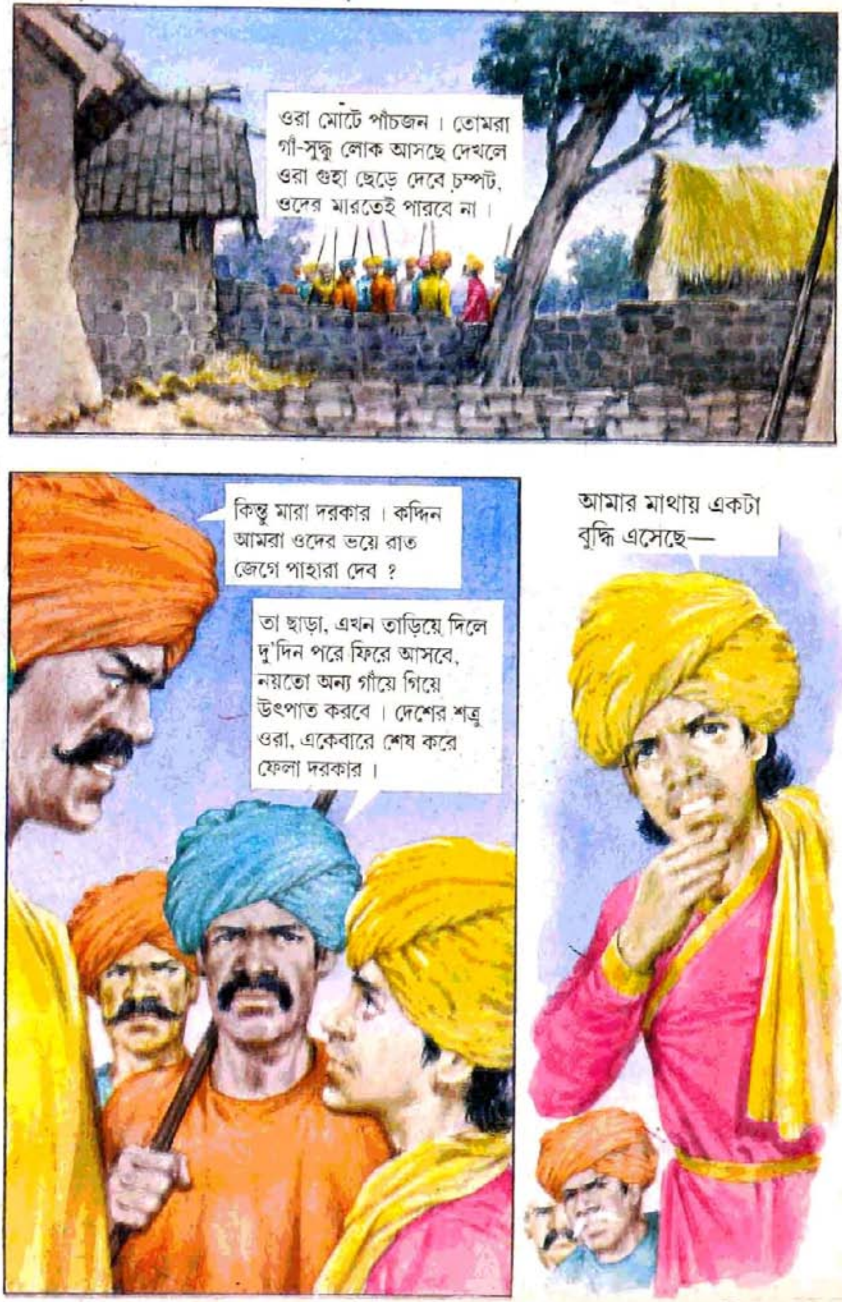
গাঁয়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে । ওরই মধ্যে একজন ষণ্ডামার্কা গ্রামবাসী বলে—





(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


শুনে মারুতি বলল…
ওরা মোটে পাঁচজন ! এক মাস আগে যখন হঠাৎ আমাদের গ্রাম আক্রমণ করেছিল, তখন আরও বেশি ছিল ।…
হুঁ । আচ্ছা, আমরা যদি গাঁয়ের লোক একজোট হয়ে ওদের গুহায় আক্রমণ করি তা হলে কেমন হয় ?
তা কী করে হবে ?
আগড় থেকে গোরু ছাগল চুরি করেছিল, মহাজনের গদি লুঠ করেছিল । তারপর থেকে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল । কিন্তু আমরাও হুঁশিয়ার আছি, ফের এলে কচুকাটা করব ।
ওরাও হুঁশিয়ার হয়েছে, সহজে আসবে না । কিন্তু পেটের জ্বালায় মরছে । তাই আমাকে পাঠিয়েছে ।


ওরা মোটে পাঁচজন। তোমরা গাঁ-সুদ্ধ লোক আসছে দেখলে ওরা গুহা ছেড়ে দেবে চম্পট, ওদের মারতেই পারবে না।
কিন্তু মারা দরকার। কদ্দিন আমরা ওদের ভয়ে রাত জেগে পাহারা দেব?
তা ছাড়া, এখন তাড়িয়ে দিলে দু'দিন পরে ফিরে আসবে, নয়তো অন্য গাঁয়ে গিয়ে উৎপাত করবে। দেশের শত্রু ওরা, একেবারে শেষ করে ফেলা দরকার।
আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে—